মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১তম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি-২০২৪ ঈসায়ী
রজব-শাবান ১৪৪৫ হিজরী
মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩০ বাংলা

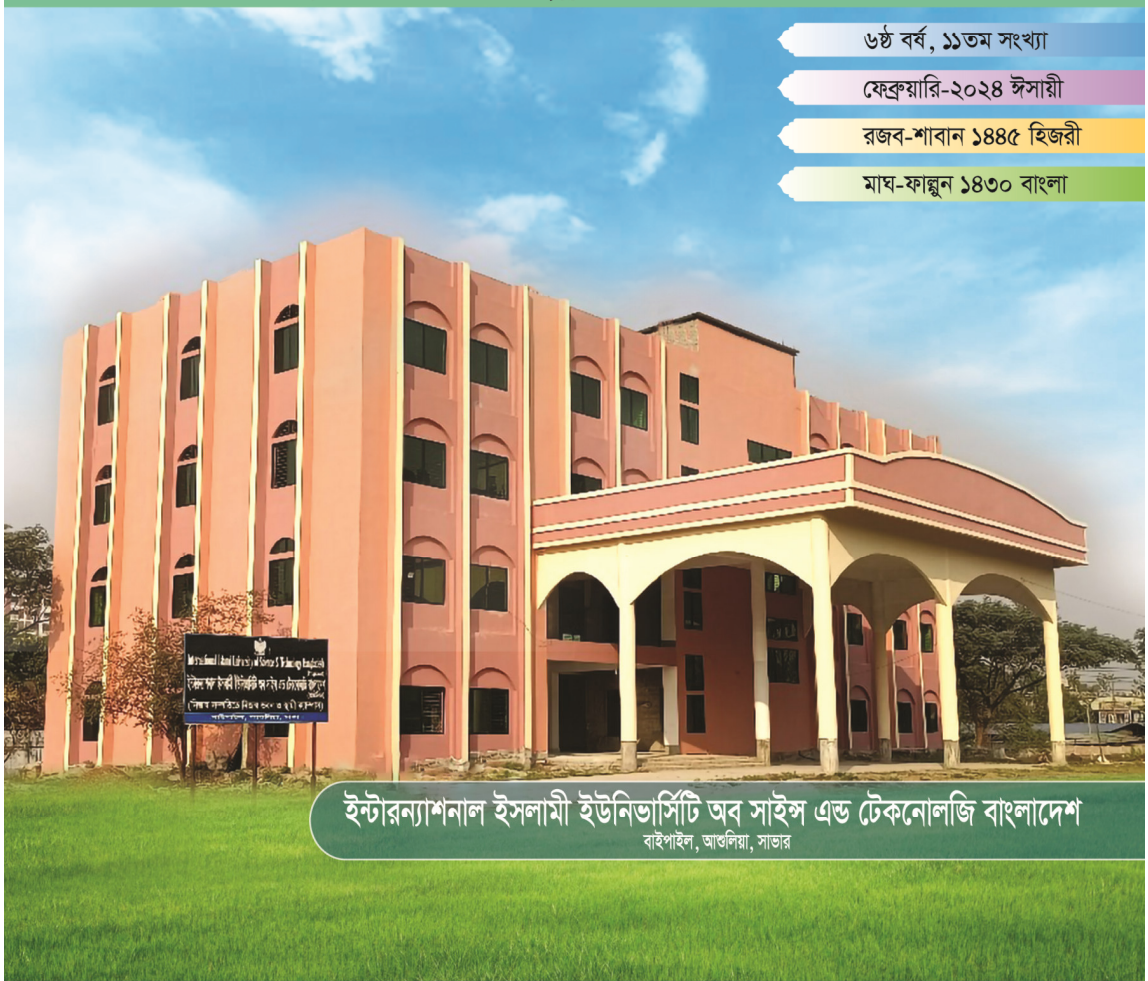

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ
বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

৩য় পর্ব
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১তম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ঈসায়ী
রজব-শাবান ১৪৪৫ হিজরী
মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩০ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ইমেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক
রেজি নং ডি.এ. ১৪২

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله ترپشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
❖ **আল্লাহর পথে দা'ওয়াত : উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও ফযীলত**।..... ৩
শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী

দারসুল হাদীস
❖ **জীবের প্রতি দয়া**।.....৬
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়
❖ **মহাসম্মেলন ২০২৪**.....৮

প্রবন্ধ :
❖ **সালাফদের মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা**।.....৯
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
❖ **দাওয়াতের মানহাজ**।.....১৪
ড: রেজাউল করিম মাদানী
❖ **ইসলামী উত্তরাধিকার আইন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ধারা**।....১৯
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
❖ **মুক্তমনা বনাম সুস্থ ভাবনা**।.....২৬
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ **সহীহ-সুন্নাহ সলাত ও নেক আমলের প্রতিদান উত্তম**.....২৯
মুহাম্মাদ রফিকুর রহমান
❖ **যুবকদের ঈমান রক্ষায় রাসূল ﷺ এর উপদেশ**।.....৩৩
তাওহীদ বিন হেলাল
❖ **ইসলামের সৌন্দর্য**।.....৩৬
সাইদুর রহমান

শুব্বান পাতা
❖ **সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার; সাম্রাজ্যবাদীদের নীলনকশা**।....৪০
মাযহারুল ইসলাম
❖ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল**।.....৪৪

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত : উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও ফযীলত

শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী❖

﴿قول الله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وقوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

আল্লাহ তাআলার বাণী : আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।[১]

আল্লাহ আরো বলেন : তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। [২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : উল্লেখিত আয়াত দুটো থেকে বুঝা গেল যে, মানুষের সফলতা অর্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো অন্যদেরকে কল্যাণের পথে দা'ওয়াত দেয়া এবং যে বা যারা দা'ওয়াতের কাজ করবে সে অথবা তারাই সর্বোত্তম ব্যক্তি বা জাতি বলে গণ্য হবে। এ থেকে আরো প্রতীয়মান হল যে, দাঈগণ সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্যতম। কেননা আল্লাহ ও ইসলামের পথে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়ার কাজটি মূলত নবী-রাসূলগণেরই কাজ। যার সর্বাগ্রে ছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾

অর্থ : হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।[৩]

দা'ওয়াতের গুরুত্ব : মানুষ যখন মহান স্রষ্টা এবং তাঁর রিসালাত ও আখেরাতের অস্বীকার এবং নাসারাসহ অন্যান্য বাতিল ধর্মাবলম্বীদের আহ্বানে সুপথ হারিয়ে বিপদগামী হতে চলেছে, এমতাবস্থায় আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই দা'ওয়াতী কাজের দায়িত্ব আলেম-ওলামা, শাসকগোষ্ঠী এমনকি প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির ওপর একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য : মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা, সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দেয়া, যাতে করে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পায়। বিশেষ করে কাফেরদের কুফরি থেকে হিদায়াতের দিকে, পথহারা অন্ধকারে নিমজ্জিতদেরকে আলোর দিকে এবং অজ্ঞদেরকে সঠিক জ্ঞানের দিকে নিয়ে আহ্বান। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফ্রি করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।[৪]

নবী এবং রাসূলগণকেও প্রেরণ করা হয়েছিল এ কাজের জন্যই অর্থাৎ, মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আহ্বান করার জন্য। অনুরূপভাবে দাঈদেরও কাজ হল মানব জাতিকে ভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করে জাহান্নামের ভয়াবহতা, শয়তানের প্ররোচনা এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবীকে বারবার নির্দেশ করেছেন দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং এর ওপর অবিচল থাকার জন্য। যেমন বলেছেন :

❖ সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।

[১] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০৪
[২] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১১০
[৩] সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৪৫-৪৬
[৪] সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৫৭

﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ﴾

অর্থ : তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

অর্থ : তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৬]

অনুরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা রা'দে বলেন :

﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ﴾

অর্থ : তুমি বল : আমি তো আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর কোনো শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি; আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।[৭] তাইতো নবী ﷺ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দা'ওয়াতী কাজ করতে করতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তাঁরই সান্নিধ্যে চলে গেছেন। কাজটি যেহেতু নবী-রসূলগণের তাই যুগে যুগে এ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির নিকট নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

অর্থ : আল্লাহর ইবাদত করবার ও তাগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি।[৮]

দা'ওয়াতের পন্থা বা পদ্ধতি : এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর।[৯]

হিকমতের অর্থ হল, অকাট্য এবং স্পষ্ট দলীলসমূহ, আর এরই প্রেক্ষিতে কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন : হিকমাহ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন এবং সুন্নাহ। আল্লামা শাওকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন : হিকমাহ হলো, ঐ সকল কথা বা বাক্য যেগুলো মানুষকে নির্বুদ্ধিতা ও অহেতুক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে (শাসকরূপে) ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণকালে বলেন,

« ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ »

সেখানের অধিবাসীদেরকে - আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) ﷺ আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন।[১০] এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, দাঈর জন্য সমীচীন হল, ছোট থেকে বড় এবং সহজ থেকে কঠিনের দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া। আর এটাই হল হিকমত।

দা'ওয়াতের ফযীলত : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তথা ইসলামের পথে দা'ওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে অনেক আয়াত এবং নবী ﷺ থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

[৫] *সূরা আল-হজ্জ, আয়াত : ৬৭*
[৬] *সূরা কাসাস, আয়াত : ৮৭*
[৭] *সূরা আর-রা'দ আয়াত : ৩৬*
[৮] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ৩৬*
[৯] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ১২৫*
[১০] *সহীহ বুখারী হা : ১৩৯৫*

অর্থ : ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কর্ম করে এবং বলে: আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।[১১]

অর্থাৎ, কথার দিক থেকে কেউ তার চেয়ে উত্তম নেই যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, ইসলাম এবং ন্যায় ও সত্যের পথে দা'ওয়াত দেয়, তার ওপর আমলও করে আর সে এও ঘোষণা করে যে, আমি আল্লাহর অনুগত বান্দা।

রাসূল ﷺ বলেছেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

অর্থ : আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে দা'ওয়াত দেয় তার জন্য সে পথের অনুসারীদের সমান সওয়াব রয়েছে। এতে তাদের সওয়াব থেকে সমান্য কম করা হয় না। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির পথে আহ্বান করে তার ওপর সে পথের অনুসারীদের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি থেকে সামান্য কম করা হবে না।[১২]

এই কাজের ফযীলত অনেক বেশি তা জেনে সৎ মানুষেরা এর প্রতি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দা'ওয়াতী কাজ বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ: اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

অর্থ, নগরের প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল, সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! রসূলদের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চায় না এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত।[১৩]

অনুরূপ হাদীসেও এসেছে- সাহল বিন সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন আলী رضي الله عنه-কে খায়বারের ইয়াহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন তখন তিনি বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়ে যায়? রসূল ﷺ বলেন : তুমি তোমার পথে চলে যাও এবং ওদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর। আর তাদের ওপর বর্ণিত আল্লাহর হকগুলোর ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে দাও। কারণ, আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন মানুষকেও হিদায়াত করেন তবে তা তোমার জন্য লাল উট থেকেও উত্তম হবে।[১৪]

সুপ্রিয় পাঠকবর্গ! আসুন একটু লক্ষ্য করি একজন দা'ঈ-র কত ফযীলত, কত সম্মান ও মর্যাদা। সে যতজন মানুষকে দা'ওয়াত দিবে অতঃপর ঐ লোকগুলো যা আমল করবে, দা'ঈ ঐ সকল মানুষের সমপরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঐ সওয়াব পেতে থাকবে।

দারসের শিক্ষা :

১. দা'ওয়াতী কাজ মূলত নবী-রসূলগণের কাজ।

২. রাসূলের উম্মত হিসেবে সকল মুসলিম ব্যক্তির জন্য দা'ওয়াতী কাজের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. দা'ওয়াতী কাজের মধ্যেই মানুষের সার্বিক সফলতা নিহিত।

আসুন! আমরা সকলেই এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন॥ ❐❑

---

[১১] *সূরা হামীম আস-সাজদাহ্, আয়াত : ৩৩*
[১২] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৬৭৪*
[১৩] *সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ২০-২১*
[১৪] *সহীহ মুসলিম, হা: ২৪০৬*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

জীবের প্রতি দয়া

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ- قَالَ « بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟ فَقَالَ « فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ »

হাদীসের অনুবাদ : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একবার এক লোক পথে হেঁটে যাচ্ছিল। তার ভীষণ পিপাসা লাগে। সে একটি কূপ দেখতে পেল। সে তাতে নেমে পানি পান করল, তারপর উঠে এল। হঠাৎ দেখল, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসার্ত কাদা চাটছে। লোকটি মনে করল, এ কুকুরটি পিপাসায় সেরূপ কষ্ট পাচ্ছে, যেরূপ কষ্ট আমার হয়েছিল। তখন সে কূপে নামল এবং তার মোজার মধ্যে পানি ভরলো তারপর মুখ দিয়ে তা কামড়ে ধরে ওপরে উঠে এল। তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! জীব-জন্তুর (প্রতি দয়া প্রদর্শনের) জন্যও কি আমাদের জন্য পুরস্কার আছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ প্রত্যেক জীবন ধারণকারী প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য প্রতিদান রয়েছে।[১৫]

হাদীসের ব্যাখ্যা : فَوَجَدَ بِئْرًا তিনি একটি কূপ দেখতে পেলেন' অর্থাৎ তিনি রাস্তায় চলতে চলতে রাস্তার কিনারে একটি কূপ পেলেন। এ থেকে জানা যায় যে, রাস্তায় চলাচলে বাধা প্রদান করে না, মানুষের কষ্ট হয় না এমন স্থানে কূপ খনন করা বৈধ। বরং মানুষের চলাচলের পথের কিনারায় পিপাসা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পানি পানের ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। যা সাদাকাহ জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ সে তাতে নেমে পানি পান করল' এ থেকে জানা যায় যে, কূপ থেকে পানি উত্তোলনের কোনো ব্যবস্থা না থাকলে কূপে নেমে পানি পান করা যায়, এতে পানি অপবিত্র হয় না। তবে হ্যাঁ নাপাক শরীর নিয়ে বদ্ধ পানিতে নামা যাবে না। কেননা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন

« لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ »

তোমাদের কেউ যেন নাপাকী অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।[১৬]

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন : « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لاَ يَجْرِى তোমাদের কেউই আবদ্ধ পানিতে পেশাব করবে না যা প্রবাহিত নয়।[১৭] এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় পানি অপবিত্র করে এমন কাজ হতে বিরত থাকতে হবে।

فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ 'অতঃপর তার মোজার মধ্যে ভরল এরপর মুখ দিয়ে তা কামড়ে ধরে ওপরে উঠে এল' কূপ থেকে ওঠার জন্য দুই হাত ব্যবহার করতে হয়েছে তাই হাত দিয়ে মোজা ধরা সম্ভব ছিল না বিধায় মোজাটি মুখ দিয়ে কামড়ে ধরতে হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, চামড়া শোধন করার পর তা পবিত্র হয়ে যায়। তাই তা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরতে কোনো বাধা ছিল না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ 'চামড়া যখন শোধন করা হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।[১৮]

فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ তারপর সে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাকে এর প্রতিদান দিলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। অর্থাৎ লোকটি পিপাসার্ত কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে তার জীবন রক্ষা করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তার কাজের প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

❖ *মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[১৫] *সহীহ বুখারী, হা : ৬০০৯*

[১৬] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৮৩, নাসায়ী, হা : ৩৩১*

[১৭] *সহীহ বুখারী, হা : ২৩৯*

[১৮] *আবূ দাউদ, হা : ৪১২৩*

দয়াময় আল্লাহ তা'আলা দয়ালুদের ওপর দয়া করেন। যারা যমীনে বসবাস করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।[১৯]

অত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যমীনে বসবাসকারীদের প্রতি দয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর যমীনে বসবাসকারী প্রাণী মানুষও হতে পারে অথবা পশু-পাখীও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অবহিত করেছেন যে, যমীনে বসবাসকারী পশুপাখী নির্বিশেষে সকল প্রাণীদের যিনি দয়া প্রদর্শন করবেন আকাশের মালিক আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দয়া করবেন। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

« عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِى هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ - قَالَ فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا ، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِيهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ »

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। এ কারণে মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ বলেন : আল্লাহ ভাল জানেন, বাঁধা থাকাকালীন, তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে। আর না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়েছিলে, তাহলে সে যমীনের পোকা মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।[২০]

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, জীবজন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্যও কি আমাদের পুরস্কার আছে? এ প্রশ্ন করার কারণ হলো সাধারণত: জীবজন্তুর প্রতি কখনো সম্মান প্রদর্শন করা হয় না বরং পশুপ্রাণীকে হেয় করা হয়। বিভিন্ন পরিশ্রমের কাজে ব্যবহার করা হয়। গাধা বোঝা বহন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। উট একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য। সুতরাং পশুকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি, এমনকি অনেক পশু যবেহ করে খাওয়া হয় যেগুলোকে আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন।

অতএব পশুর প্রতি আবার দয়া প্রদর্শন করা হয় নাকি? আর এজন্য আবার পুরস্কারও আছে?

[১৯] *তিরমিযী, হা : ১৯২৪*
[২০] *সহীহ বুখারী, হা : ২৩৬৫*

রাসূল ﷺ তাদের এ সংশয় দূর করে দিয়ে বললেন : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ হ্যাঁ প্রত্যেক জীবন ধারণকারী প্রাণীর পতি দয়া প্রদর্শনের জন্য পুরস্কার রয়েছে। এ জন্যই রাসূল ﷺ সকল প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি কোনো প্রাণীকে যবেহ করতে চাইলে তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة যখন তোমরা কোনো প্রাণী যবেহ করবে তখন তোমরা ঐ যবেহ করাকালীন সময়ে পশুর প্রতি দয়া করবে।[২১]

তাই তো পশু যবেহ করার পূর্বে ছুরিকে সুন্দর করে ধারালো করে নিতে বলেছেন। মদীনায় একবার কিছু বালক একটি পাখীকে তীর ছোঁড়ার নিশানা বানালে ইবনু উমার ﷺ বলেন :

إن رسول الله ﷺلعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তিকে লানত করেছেন যিনি কোনো প্রাণীকে তীর ছোঁড়ার নিশানা বানিয়েছে।[২২] এরূপ অসংখ্য হাদীস রয়েছে যাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রাণীকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন এবং সেগুলোর প্রতি দয়া প্রদর্শনের আদেশ করেছেন।

হাদীস হতে শিক্ষা :

১. দ্বীনী অথবা দুনিয়াবী প্রয়োজনে সফর করা বিধিসম্মত।
২. পিপাসার্ত হওয়া প্রাণীর বৈশিষ্ট্য।
৩. পিপাসার্ত ব্যক্তির পিপাসা দূর করার জন্য পানির কূপে নামা বৈধ।
৪. মানুষের চলাচলে বাধা বা কষ্ট প্রদান করে না এমন স্থানে কূপ খনন করা বৈধ।
৫. মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাওয়াবের আশায় কূপ খনন করা মুস্তাহাব।
৬. প্রাণীর কষ্ট লাঘব করলে সাওয়াব অর্জিত হয়।
৭. কোনো ব্যক্তি পশুর প্রাণ রক্ষা করলে আল্লাহ তার কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।
৮. শিরক ব্যতীত সকল গুনাহগার আল্লাহর ক্ষমার আওতাধীন।
৯. অহেতুক কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হারাম।
১০. সাওয়াব অর্জনের কোনো কাজকেই অবহেলা করতে নেই।
১১. পশু-প্রাণীর প্রতি দয়াশীল হওয়া শরীয়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য। ❐❑

[২১] *তিরমিযী, হা : ১৪০৯*
[২২] *সহীহ মুসলিম, হা : ১৯৫৮*

সম্পাদকীয় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর দা'ওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন ২০২৪ الافتتاحية

আগামী ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি আবারও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আহলে হাদীস মতাদর্শের অনুসারী দেশের সর্বপ্রাচীন বৃহত্তম সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন। সময়ের প্রেক্ষাপটে জমঈয়তের এ মহাসম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব যখন ভূরাজনৈতিক অস্থিরতায় বিপর্যস্ত, চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইউরোপ অশান্ত, ফিলিস্তিনের ওপর জায়নবাদী ইসরাইলের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ও নারকীয় তাণ্ডবে অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য, পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা, ডলারের মূল্যবৃদ্ধিসহ বহুমাত্রিক সমস্যায় অশান্ত ও অস্থির পৃথিবী। এহেন মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এ মহাসম্মেলন। বাংলাদেশের পেক্ষপটেও বলা যায় সময়টি কিছুটা অস্থির সময়। রাজনৈতিক অঙ্গনে নির্বাচনের পর একটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসলেও সহিংসতার আশঙ্কা একেবারে দূর হয়ে যায়নি। শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন কারিকুলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আরেক ধরনের অস্থিরতা। ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। শিশুদেরকে এসব বিষয়ে পাঠদানকে আমাদের সমাজ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ইউরোপে যা চলে তা আমাদের সমাজে চালানোর প্রচেষ্টা কল্যাণকর হতে পারে না। আমাদের বিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের বিচক্ষণতার অভাব দেখে হতবাকই হতে হয়। কোমলমতি শিশুদের পাঠ্য তালিকায় ট্রান্সজেন্ডারের মতো স্পর্শকাতর বিষয় টেনে আনার কি খুবই প্রয়োজন ছিল? শিশুদেরকে রূপান্তরিত বিবর্তনবাদ না পড়ালে তাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে না বলে যারা মনে করেন তাদের ব্যাপারে নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। আসলে এরা কাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে? ইত্যকার বহু বিষয় আমাদের জাতীয় জীবনেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আমাদেরকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে। সততা আজ বিলুপ্ত। সদাচরণ এখন পুস্তকের পরিভাষা। তরুণরা মাদকে আসক্ত। ধর্মের নামে চলে মাজার পূজা। ধর্মীয় উৎসবের নামে গানবাজনা, মিথ্যা গল্পকাহিনীর ছড়াছড়ি। মানুষ তাওহীদ কী জিনিস জানে না। তারা পুন্যের আশায় শির্কে নিমজ্জিত। বিদ'আতমুক্ত আমল তো কল্পনার বিষয়। এহেন কঠিন সময়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় মহাসম্মেলন। গত বছরের মহাসম্মেলন ব্যাপকভাবে সফল হয়েছিল বিদেশি মেহমানদের অংশগ্রহণে। এবারও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারত, নেপাল, সউদী আরব, জর্ডান, মিসরসহ বিভিন্ন দেশের ইসলামিক স্কলারদের। গত বছরের সম্মেলনে এসেছিলেন আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানীর জামাতা। এবারও তিনি আসবেন মর্মে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মক্কা বায়তুল্লাহ ও মদীনার মসজিদে নববীর সম্মানিত ইমামদের সাউদী ধর্মমন্ত্রীর মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এক দুইজন সম্মনিত ইমাম এ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, আরবি ভাষাবিদ, বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। বিদেশি মেহমানদের পাশাপাশি দেশীয় ইসলামী চিন্তাবিদ, শায়েখ-মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম মহাসম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন। শিরক-বিদ'আতমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি। আমরা এ মহাসম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করুন। আমীন!

❐❑

সালাফদের মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা

মূল : আল্লামা সালেহ ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ
অনুবাদ : আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী★

(পর্ব- ১)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد :

এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সালাফ আস-সালেহ কথাটি বলতে এই উম্মতের প্রথম শতাব্দী বা প্রথম যুগের কিংবা প্রথম সারির মানুষগুলোকে বুঝায়। তারা হলেন রাসূল ﷺ-এর মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নদীসমূহ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহান সফলতা"।[২৩] এই আয়াতে মুহাজির ও আনসারদের ফযীলত একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরদের ফযীলত বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

'এ সম্পদ সেসব গরীব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ী ও বিষয়-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এসব লোক চায় আল্লাহর মেহেরবানী এবং সন্তুষ্টি। আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী।[২৪] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা খাসভাবে আনসারদের ফযীলতের ব্যাপারে বলেন,

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

আর তা গণীমতের সম্পদ সেসব লোকের জন্যও যারা এসব মুহাজিরদের আগমনের পূর্বেই ঈমান এনে দারুল হিজরতে বসবাস করেছিলো। তারা ভালোবাসে সেসব লোকদের যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। যা কিছুই তাদের দেয়া হোক না কেন এরা নিজেদের মনে তার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না এবং যত অভাবগ্রস্তই হোক না কেন নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়। মূলত যে লোককে তার মনের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম। অতঃপর সাহাবীদের যুগের পরবর্তী যুগে আগমনকারী মানুষদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

'তা অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সেইসব লোকের জন্যও যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে। তারা

★ *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী-কেন্দ্রীয় জমঈয়ত। ও মুহাদ্দিছ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।*

[২৩] *সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১০০*

[২৪] *সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৮*

বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেইসব ভাইকে মাফ করো যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু"।[২৫] সাহাবীদের পরে আগমনকারী তাবেঈ ও তাবে, তাবেঈনদের ব্যাপারে নবী ﷺ বলেন,

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة.

'তোমাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে আমার যুগের মানুষগণ। অতঃপর যারা তাদের পরে এসেছে। অতঃপর যারা এসেছে তাদের পরে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, রাসূল ﷺ-এর যুগের পরে দু'টি যুগের কথা উল্লেখ করেছেন, না কি তিনটি যুগের কথা বলেছেন।[২৬] তাদের যুগকে বলা হয় স্বর্ণযুগ। অর্থাৎ সাহাবী, তাবেঈ ও তাবউত্ তাবেঈনদের যুগকে বলা হয় সম্মানিত যুগ। এরাই হলেন এই উম্মতের সালাফ। আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন এবং রাসূল ﷺও তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা হলেন এই উম্মতের আদর্শ। তাদের মানহাজ বলতে বুঝায় সেই পথ ও পদ্ধতিকে, যাতে তারা চলেছেন। অর্থাৎ আকীদাহ, আমল, আচার-আচরণ এমনকি তাদের সমস্ত বিষয় ও ক্ষেত্রে তারা যে নীতি ও পথ অবলম্বন করেছেন, সেটাই হচ্ছে তাদের মানহাজ। এই মানহাজটা তারা গ্রহণ করেছেন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে। কারণ তারা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর একদম কাছের মানুষ। তারা কুরআন নাযিল হতে দেখেছেন। তাই তারা সহজেই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তাদের চলার পথ ও পদ্ধতি সহজেই আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তাদেরকে যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সর্বোত্তম মানুষ বলেছেন, তাই তাদের মানহাজও (পথ-পদ্ধতি) সর্বোত্তম মানহাজ হিসেবে স্বীকৃত। এ জন্যই মুসলিদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে, তারা সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে, যাতে তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজের ওপর থাকতে পারে। সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে তাদের মানহাজের ওপর চলা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾

"যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ নিপুণতা, দৃঢ়তা, যথার্থতা ও পরিপূর্ণতার সাথে যারা মুহাজির ও আনসাদের অনুসরণ করবে, তারাও কিয়ামতের দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করবে। আর সালাফদের মানহাজ জানা ব্যতীত তাদের মানহাজ উত্তমভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে না। সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে না জেনে তাদের প্রতি নিজেকে সম্বন্ধ করা এবং নিজেকে সালাফী দাবি করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। সে যেমন নিজের উপকার করতে পারবে না, অনুরূপ অন্যেরও উপকার করতে পারবে না। বরং সে আরো ক্ষতি করবে। অতএব সালফ সালেহীনদের মানহাজ সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

এ জন্যই এই উম্মতের প্রকৃত আলেমগণ সালাফদের মানহাজ পাঠ করেন এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদের জন্য বর্ণনা করেন। তাদের মসজিদে মাদরাসায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা পড়ানো হয়। সালাফদের মানহাজ জানা ও তা অন্যদেরকে জানানোর মাধ্যম হচ্ছে এটা পড়া এবং অন্যদেরকে পড়ানো। এভাবেই আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে গৃহীত সালাফদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি মানহাজ গ্রহণ করবো। নবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, এই উম্মতের মধ্যে অচিরেই প্রচুর মতভেদ দলাদলি হবে। তিনি বলেন :

افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَستَفْتَرِقُ هذه الأمة عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كلها في النار إلا واحدة ، قيل : من هي يا رسول الله؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

[২৫] *সূরা আল-হাশর, আয়াত : ১০*
[২৬] *সহীহ বুখারী, হা : ২৬৫১*

"ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছিল ৭১ দলে। খ্রিষ্টানরা বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে"। মাত্র একটি দল ব্যতীত বাকী সব দলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি কোন দল? তিনি বললেন : আমি এবং আমার সাহাবীগণ আজ যেই পথে আছি, সেই পথে যারা থাকবে, তারাই হবে নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত"।[২৭] রাসূল ﷺ যে পথের ওপর ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীগণ যে পথের ওপর ছিলেন, সেটাই সালাফদের মানহাজ। আল্লাহ তা'আলা সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে জানা এবং তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ, এটাই হচ্ছে নাজাতের পথ। সমস্ত ফির্কাই জাহান্নামে যাবে। মাত্র একটি ফির্কা নাজাত পাবে। এটাই হচ্ছে নাজাতপ্রাপ্ত ফির্কা। এরাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। মানুষ যখন মতভেদ করে এবং যখন বহু মত ও পথের আবির্ভাব হয়, তখন আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সালাফদের মানহাজের ওপর অবিচল থাকে।

একদা রাসূল ﷺ তাঁর শেষ জীবনে আমাদেরকে এমন একটি প্রভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন, যাতে আমাদের চোখের পানি প্রবাহিত হলো এবং অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। তখন একজন বলল,

يا رسول الله : كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ السمع والطاعة لمن؟ لولاة أمور المسلمين، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تآمر عليكم عَبْد فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بعدي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হচ্ছে এটি বিদায়ী উপদেশ। আপনি আমাদেরকে আর কিসের উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করা, আমীরের কথা শ্রবণ করা এবং তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা সে সময় আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং উহাকে মাড়ির দাঁতগুলো দিয়ে কামড়িয়ে ধরবে। আর তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতের পরিণাম গোমরাহী"।[২৮]

এটাই হচ্ছে উম্মাতের জন্য রাসূল ﷺ-এর অসীয়ত। তিনি তাদেরকে সালাফদের মানহাজের ওপর টিকে থাকার আদেশ দিয়েছেন। কারণ, এটাই নাজাতের পথ এবং এটাই জান্নাতের পথ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

'নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বাঁচতে পারো'।[২৯] অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে বাঁচতে পারো সমস্ত ভ্রান্ত ফির্কা থেকে, বাঁচতে পারো বিভ্রান্তি ও ফিতনা থেকে এবং আখেরাতে বাঁচতে পারো জাহান্নামের আগুন থেকে।

বিশেষ করে আখেরী যামানায় যারা সালাফদের মানহাজের ওপর অটল থাকবে, তারা বিরোধীদের থেকে কষ্ট পাবে, বিরোধীরা তাদেরকে ধমক দেবে এবং তাদের ওপর যুলুম করবে। এতে সবর করতে

[২৭] ইবনু আবী আসেম কিতাবুস সুন্নাতে বর্ণনা করেছেন, হা : ৬৩, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহা, হা : ১৪৯২, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, হা : ৪০৬৩। ইমাম ইবনে কাসীর এবং অন্যান্য হাফেযগণ বলেন : এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদে সহীহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি সুনান এবং অন্যান্য গ্রন্থেও রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন নযরও কিতাবুল ইতেসামে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

[২৮] *আবু দাউদ, অধ্যায় : কিতাবুস্ সুন্নাহ, তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল ইল্‌ম। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। মুসনাদে আহমাদ, (৪/১২৬), মাজমুওয়ায়ে ফাতাওয়া (১০/৩৫৪)।*

[২৯] *সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ১৫৩*

হবে। এই পথ থেকে বিরত রাখার জন্য বহু প্রলোভন আসতে পারে, ভ্রান্ত ফির্কা এবং বিচ্যুত মানহাজের অনুসারীদের পক্ষ থেকে লোভ দেখানো হতে পারে। লোভ দেখিয়ে তাদেরকে সালাফদের সঠিক মানহাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারলে ধমক আসতে পারে। এ সময় সবর করা আবশ্যক। রাসূল ﷺ বলেন :

«بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»

অপরিচিত অবস্থায় অল্প কয়েকজন লোকের মাধ্যমে ইসলামের সূচনা হয়েছে। অচিরেই পুনরায় অপরিচিত অবস্থায় ফেরত যাবে। সুতরাং এই অপরিচিত অল্প সংখ্যক লোকের জন্যই সুসংবাদ।[৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ-কে বলা হলো, এই অল্প কয়েকজন লোক কারা? তিনি বললেন, এরা ঐসব লোক যারা মানুষের বিভ্রান্তি ও ফাসাদ সংশোধন করবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মানুষেরা যা নষ্ট করবে, তারা তা সংশোধন করবে।[৩১] অতএব দুনিয়াতে গোমরাহী এবং আখেরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে তারাই বাঁচতে পারবে, যারা সালাফদের পথে চলবে। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا* ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾

"আর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ঐ সমস্ত লোকের সাথে থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; তারা হলেন নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। কতই না উত্তম বন্ধু তারা"।[৩২]

যারা সালাফদের পথে চলবে, তারা আখেরাতে নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু দুনিয়াতে তারা সংকীর্ণতা, নিন্দা, প্রলোভন, ধমক, নির্যাতন ইত্যাদির শিকার হবে। এমতাবস্থায় সবরের প্রয়োজন রয়েছে। সহীহ হাদীসে এসেছে, আখেরী যামানায় দ্বীনের ওপর টিকে থাকা হাতে জ্বলন্ত আঙ্গারা রাখার মতোই কঠিন হবে। হাতে জ্বলন্ত আঙ্গারা রাখা যেমন কষ্টকর, সেরকম কষ্টই স্বীকার করতে হবে আখেরী যামানায় দ্বীনের ওপর টিকে থাকার জন্য। সালাফদের পথে ফুলের বিছানা বিছানো থাকবে না, এ পথ কষ্টশূন্য থাকবে না। এতে রয়েছে মানুষের কষ্ট।

বর্তমানে পত্রপত্রিকায়, বই-পুস্তকে এবং টেলিভিশনে সালাফীদের মানহানি করা হয়। তাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তারা কট্টরপন্থী, তাকফীরি, দরবারি ইত্যাদি। এরকম আরো অনেক কথাই বলা হয়। এরকম কথা সালাফীদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু যার নিকট সবর ও শক্তির দৃঢ়তা নেই, সে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তার মন ভেঙে যেতে পারে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, সালাফ কারা? কেউ কেউ বলতে পারে, সালাফীরা ইসলামের নামে প্রচলিত বিভিন্ন ফির্কার মতোই একটি ফির্কা কিংবা অন্যান্য দলের মতোই একটি দল। তাদের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কেউ কেউ এরকম বলতে পারে। তাদের এসব কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা আমাদেরকে সালাফদের পথ থেকে দূরে রাখতে চায়।

কেউ কেউ মনে করে, আমরা সালাফদের মানহাজ গ্রহণ করতে এবং তাদের ইলম গ্রহণ করতে বাধ্য নই। আমরাই রাস্তা বের করতে সক্ষম। আমরা নতুনভাবে ইজতেহাদ করব। সালাফদের ফিক্হ ও ইলম পুরাতন হয়ে গেছে। দেড় হাজার বছরের পুরাতন মতবাদ এখন চলবে না। তাই সালাফদের মানহাজ বর্তমান সময়ের জন্য উপযুক্ত নয়। তাদের মানহাজ তাদের যুগের জন্য উপযুক্ত ছিল। তাদের যুগ আর আমাদের যুগ এক নয়। এজাতীয় কথা বলে তারা সালাফদের মানহাজ এড়িয়ে চলে এবং নতুন ফিক্হ ও মানহাজের দিকে আহ্বান জানায়। বাতিলপন্থিরা পত্রপত্রিকায় এবং বই-পুস্তকে এ ধরনের কথা প্রচুর লিখে। তাদের উদ্দেশ্য

[৩০] *সহীহ মুসলিম, হা : ১৪৫*
[৩১] *ইমাম আজুররী রচিত আলগুরাবা, ১/২। হাদীসের সনদ সহীহ, সিলসিলায়ে সহীহা, হা : ১২৭৩।*
[৩২] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৬৯*

হচ্ছে, মানুষকে সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে ইলম অর্জন করা থেকে সরিয়ে রাখা। তাদের কথায় কর্ণপাত করা যাবে না। কারণ, আমরা যদি সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে ইলম অর্জন না করি, তা যদি পরিত্যাগ করি এবং সেটা নিয়ে যদি পড়াশোনা না করি, তাহলে সালাফদের প্রতি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে কোনো লাভ হবে না।

বিরোধীরা চায় যে, আমরা সালাফদের ইলম ছেড়ে দেই, তাদের মানহাজ ছেড়ে দেই এবং তাদের ন্যায় নতুন মাযহাব গ্রহণ করি। যারা বলে, বর্তমান সময়ে সালাফদের মানহাজ উপযুক্ত নয়, তাদের কথা মিথ্যা। বরং সালাফদের মানহাজ সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য উপযুক্ত ও উপকারী।

ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

لا يَصْلُحُ آخِرُ هذه الأمةِ إلا ما أَصْلَحَ أَوَّلَهَا

“এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা যার মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিলো, তা ব্যতীত শেষ যুগের লোকদের সংশোধন হওয়া অসম্ভব। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম যুগের মানুষকে কিসে সংশোধন করেছিল? কিসের মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা লাভ করেছে? কিসের মাধ্যমে তারা জান্নাতের সনদ লাভ করেছে?

কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণ করেই সাফল্য লাভ করেছেন। তাই আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে সাফল্য লাভ করতে হলে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত এবং সালাফদের পথে চলতে হবে। আলেমগণ সালাফদের মানহাজকে নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তীর সাথে তুলনা করেছেন। যারা তাতে আরোহণ করেছিল, তারা নাজাত পেয়েছে। আর যারা তাতে আরোহণ করেনি, তারা ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বিভ্রান্তি, গোমরাহী ও ফিতনা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় এবং আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চায়, সে যেন সালাফদের মানহাজ সম্পর্কে ইলম অর্জন করে, এটাকেই যেন লালন-পালন করে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত এটাকে আঁকড়ে থাকে।

পরিশেষে আমরা সমস্ত মুসলিম বিশেষ করে আলেম, ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশে বলতে চাই, তারা যেন সালাফদের মানহাজের সাহায্য করে। জাতির আলেমদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে, তারা যেন তাদের যুবকদেরকে সঠিক পথে চলার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এবং বহিরাগত মতবাদ ও বিকৃত মানহাজকে প্রতিহত করে। সেই সঙ্গে বহিরাগত মতবাদের মধ্যে যেই গোমরাহী, ধোঁকা, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণা রয়েছে, আলেমগণ যেন তাও বর্ণনা করে দেন। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

সুরে সুরে শেকড়ে শিখরে

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস তা‘লীমী বোর্ডের অধীনে পরিচালিত মাদরাসাগুলোতে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ছড়িয়ে দিতে ও সুরে সুরে মধুর সুরকে নির্বাচন করতে শীঘ্রই শুরু হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামিক সঙ্গীত ক্যাটাগরিতে শেকড় সেরা সুর ২০২৪ সিজন-১।

সুষ্ঠুভাবে অঞ্চল ভিত্তিকভাবে বাছাই পর্ব শেষে সেরা সুর নির্বাচন করতে আর্থিক সহায়তা পেতে টাইটেল স্পন্সর, পাওয়ার্ড বাই, প্লাটিনাম, ডায়মন্ড ও গোল্ড আকারে স্পন্সর আহ্বান করা হচ্ছে। এ জন্য আমাদের মাঝে আপনার প্রতিষ্ঠানকে আরো পরিচিত করতে এগিয়ে আসার অনুরোধ রইলো।

যোগাযোগ : +৮৮০ ১৫৭১ ৭৭৪৮১৯,

আবু লায়েস ফাহিম, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

আহ্বানে
আব্দুল মতিন
আহ্বায়ক, শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)

দাওয়াতের মানহাজ

ড: রেজাউল করিম মাদানী*

একজন মুসলমানের জন্য পৃথিবীর সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে দাওয়াতি কাজ। অতএব এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের মানহাজ বা পদ্ধতি (Methodology) জানাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আল্লাহর নির্দেশিত, রাসূল ﷺ ও সালফে সালেহীনগণ প্রদর্শিত এ দাওয়াতি কাজের একটি মানহাজ (Methodology) আছে। যা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবা তাবে-তাবেঈনদের দাওয়াতি জীবনী থেকে (গৃহীত) গবেষণালব্ধ। অতএব, যারা এ গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি কাজ করতে চান তাদেরকে অবশ্যই এ মানহাজকে অনুসরণ করতে হবে। তা নাহলে দাওয়াতি ময়দানে সফলতার চেয়ে বেশি ব্যর্থ হবেন। কখনো কখনো কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হবে। আবার কখনো হিতে বিপরীত হতে পারে। এদিকে লক্ষ্য রেখে দাঈ ভাইদের জন্য দাওয়াতি মানহাজের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও কিছু দাওয়াতি মানহাজ উল্লেখ করা হলো।

منهج الدعوة শব্দটি দুটি আরবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি **منهج** অপরটি দাওয়াহ **الدعوة**

আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র **منهج** শব্দটি।

منهج শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পদ্ধতি, স্পষ্ট রাস্তা, চলার পথ, সরল পথ ইত্যাদি।

منهج শব্দটির পারিভাষিক সংজ্ঞা : যদিও **منهج** শব্দটি সাধারণ অর্থে বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দাওয়াতি ক্ষেত্রে **منهج الدعوة** বলতে কী বুঝায়, নিম্নে কিছু সংজ্ঞা প্রদান করা হল।

(১) **منهج الدعوة** হচ্ছে, কুরআন সুন্নাহ হতে প্রমাণিত ও সালফে সালেহীন কর্তৃক গৃহীত দাওয়াতি কাজ প্রচার প্রসারের জন্য নির্ধারিত কিছু নিয়মনীতি, কায়দা-কানুন, যা নবী ﷺ সাহাবাগণ ও সালফে সালেহীনগণ নিজ নিজ দাওয়াতি কাজে অনুসরণ করেছিলেন।[৩৩]

(২) আবার কেউ কেউ বলেন :

نُظمُ الدَّعوة وخُططها المرسومة لها.

অর্থাৎ, দাওয়াতি কার্যক্রম প্রচার প্রসারের নিমিত্তে নির্ধারিত কিছু নিয়মনীতি ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা।

মোটকথা: নির্ধারিত কিছু নিয়ম-নীতি কায়দা-কানুন বা পদ্ধতি, যা একজন দাঈ ইলাল্লাহকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সফল ও সার্থক হতে, দাওয়াতকে ফলপ্রসূ করার জন্য অনুসরণ করতে হয়, ঐ সকল নিয়ম-নীতি কায়দা কানুন ও পদ্ধতিতে মানহাজ বলে।

দাওয়াতি মানহাজের গুরুত্ব:

সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, দাওয়াতের মানহাজ কুরআন সুন্নাহ হতে গৃহীত, গবেষণালব্ধ যা একটি উপযোগী, হিকমত ও বাস্তব সম্মত কিছু মূলনীতির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

অতএব, প্রত্যেক দাঈ ইলাল্লাহ-কে এ মানহাজের অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে। পক্ষান্তরে নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত, প্রবৃত্তিনির্ভর মানহাজকে পরিত্যাগ ও পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

অর্থ : বল, এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।[৩৪]

নবী ﷺ নিজে যেমন তার দাওয়াতে এ মানহাজ অনুসরণ করতেন, ঠিক তেমভাবে যখন কোনো দাঈকে কোনো এলাকায় বা স্থানে দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করতেন তখন তাকেও এ মানহাজ অনুসরণ করে দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দিতে বলতেন। যেমন: মুয়াজ বিন জাবাল-রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে যখন দাওয়াতের কাজে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন তখন তাকে এ মানহাজ অনুসরণ করতে বলেছিলেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ " إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ

---

* পি এইচ ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

[33] منهج الدعوة السلفية মুহা : আ: রাজ্জাক-১/৩১

[৩৪] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৮

طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ .

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয ইবনু জাবালকে (গভর্নর বানিয়ে) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাঁকে বললেন, অচিরেই তুমি আহলে কিতাবদের এক গোত্রের কাছে যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ দাওয়াত দেবে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল', এরপর তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচবার সলাত ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের (মুসলিমদের) সম্পদশালীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তাহলে (তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করার সময়) তাদের মালের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে, কেননা, মজলুমের বদদোয়া এবং আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দার আড়াল থাকে না।[৩৫]

অতএব, একজন মোখলেস এবং সফল দাঈকে অবশ্যই দাওয়াতের ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ হতে প্রমাণিত, প্রতিষ্ঠিত মানহাজ্ব অনুসরণ করতে হবে। তা না হলে তিনি দাওয়াতি কাজে যেমন ব্যর্থ হবেন, সাথে সাথে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

১নং ইবাদত-আহকামের পূর্বে ঈমানের দিকে আহ্বান করা :

অর্থাৎ দাওয়াত প্রদানের সময় আমল, ইবাদত-আহকাম, মুয়ামালাত, হারাম-হালাল ইত্যাদির দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে, ঈমান তথা আকীদার দাওয়াত দিতে হবে। বিশেষ করে, দাওয়াত যদি বিধর্মীদের দেওয়া হয় অথবা মুসলিম কিন্তু শিরিক-বিদআত, খুরাফাত ইত্যাদির সাথে জড়িত থাকে অথবা দুর্বল ঈমানের মুসলিম হয়।

কেন এই মানহাজ?

কেননা ঈমান তাকে ইবাদতের দিকে ধাবিত করবে, আমলের প্রতি উৎসাহিত করবে। যেমনিভাবে ঈমান মানুষকে অন্যান্য ইবাদত, আখলাক, মুয়ামালাত, আদেশ-নিষেধ হুকুম-আহকাম মানতে সাহায্য করবে উৎসাহিত করবে, ঠিক তেমনিভাবে গুনাহের কাজ – আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হওয়া থেকে রক্ষা করবে। বিশেষ করে, মানুষের ঈমান যখন পরিপক্ক হয় এবং আকিদা বিশুদ্ধ হয়, তখন সে ইবাদত করতে উৎসাহিত হয় এবং ইবাদত করে তৃপ্তি সহকারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঈমান বাড়ে ও কমে। যখন মানুষের ঈমান কমে যায়, তখন ওই ব্যক্তির ওপর ইবাদত করা কঠিন হয়ে যায় এবং পাপের কাজ ছাড়াও কঠিন হয়ে যায়। আর যখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়, তখন তার আকিদা বিশুদ্ধ করা যেমন সহজ হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে ইবাদতে আগ্রহী হয় ও ইবাদত করে তৃপ্তি পায়। সাথে সাথে আহ্বানকৃত ব্যক্তি (মাদউ) কর্তৃক দেওয়া কষ্ট তার জন্য বেশি কষ্টকর হয় না। ঈমান ছাড়া আমল কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾

অর্থ : নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সলাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে। তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না।[৩৬]

﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۞ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

[৩৫] সহীহ বুখারী, হা : ৪৩৪৭

[৩৬] সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৪২ - ১৪৩

অর্থ : আর তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন, যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর দিকে ফিরে যাবে।[৩৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে, তার আগের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় 'ইবাদাতে রাত কাটাবে, তার আগের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল কদরে 'ইবাদাতে কাটাবে তারও আগের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে।[৩৮]

২নঃ আল্লাহ তা'আলা আমলের তথা ইবাদতের পূর্বে ঈমান আনার নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি, যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবের প্রতি, যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।[৩৯]

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾

অর্থ : আমার বান্দাদের বল, 'যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোনো বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও।[৪০]

এ ধরনের অনেক আয়াত পাওয়া যায়, যেখানে আল্লাহ ইবাদত তথা আমলের পূর্বে ঈমান আনার নির্দেশ করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি ঈমান আনলো না, সে আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলের আদেশের মর্ম বুঝবে না এবং উপদেশ দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

এজন্য নবী-রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে ইবাদতের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত দিতেন। আমাদের নবী ﷺ দীর্ঘ ১৩ বৎসর মক্কাতে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

التعليم والبلاغ لا الحكم والحساب

২নঃ দাঈ ইলাল্লাহর কাজ শিক্ষা প্রদান ও দাওয়াত পৌঁছানো, কারো ওপর ঢালাওভাবে হুকুম না লাগানো এবং হিসাব-নিকাশ না নেওয়াঃ

এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন দাঈ ইলাল্লাহর কাজ হচ্ছে, মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদেরকে দ্বীনি বিষয়ে মাসআলা-মাসায়েল বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া। কথায় কথায় তাদের ওপর কাফের, ফাসেক, মুশরিক, বিদআতী ইত্যাদি হুকুম না লাগানো এবং তাদের জবাবদিহি না করা। কারণ ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষদেরকে হেদায়েত করা এবং দ্বীন শেখানো, তাদের ওপর বিভিন্ন হুকুম বা ট্যাগ লাগানো নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব

[৩৭] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৫ - ৪৬*
[৩৮] *মিশকাতুল মাসাবীহ, হা : ১৯৫৮*
[৩৯] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৩৬*
[৪০] *সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩১*

ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।[৪১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

অর্থ : সুতরাং স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রাসূলদের কি কোনো কর্তব্য আছে?[৪২]

যদিও দাওয়াতকৃত ব্যক্তিরা দাঈর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, তারপরেও দাঈর কাজ হল, শুধু দাওয়াত পৌঁছানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾

অর্থ : আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি। বাণী পৌঁছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব। আর আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই তখন সে খুশি হয়। আর যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের ওপর কোনো বিপদ আসে তখন মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়।[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾

অর্থ : নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্য; তাই যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা নিজের জন্যই করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।[৪৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

অর্থ : আর যে প্রতিশ্রুতি আমি তাদেরকে দিচ্ছি, যদি তার কিছু তোমাকে দেখাই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই (তাতে কিছুই আসে যায় না)। তবে তোমার কর্তব্য কেবল পৌঁছে দেয়া, আর আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া।[৪৫]

নবী-রাসূল ও সাহাবাগণ দাওয়াতি কাজ প্রচার-প্রসার করতেন। নির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ ব্যতীত কারো ওপর কাফের, মুশরিক, মুনাফিক ইত্যাদির হুকুম লাগাতেন না। এজন্য ইসলামী দাওয়াত সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের সমন্বয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

অর্থ : আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে'।[৪৬]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

অর্থ : আর আমি তো তোমাকে শুধুমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি।[৪৭]

এতদসত্ত্বেও অনেক দাঈকে দেখে মনে হয় তারা যেন ঐ সকল আহ্বানকৃত (মাদউ) ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন, যদি তারা দাওয়াত গ্রহণ না করেন বা না মানেন। ফলে তাদের ওপর হুকুম লাগাতে ব্যতিব্যস্ত। এজন্য আপনি যদি কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীস তন্নতন্ন করে খোঁজেন, তাহলে একটি আয়াত বা একটি হাদিসও পাবেন না, যেখানে বলা হয়েছে যে, দাওয়াত গ্রহণ না করলে হুকুম লাগাতে হবে; বরং যেটা পাবেন সেটা দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ। আর হুকুমের ব্যাপারটি হচ্ছে,

﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

অর্থ : তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন।[৪৮]

আর হুকুম লাগানোর ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদিস থেকে যেটা জানা যায়, তা হল :

كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ

[৪১] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াতে : ১৬৪*
[৪২] *সূরা নাহল, আয়াত : ৩৫*
[৪৩] *সূরা আশ-শুরা, আয়াত : ৪৮*
[৪৪] *সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৪১*
[৪৫] *সূরা আর-রাদ, আয়াত : ৪০*
[৪৬] *সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ১৮৮*
[৪৭] *সূরা ফুরকান, আয়াত : ৫৬*
[৪৮] *সূরা আল-হজ্জ, আয়াত : ৬৯*

يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ

অর্থ : বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিলো। তাদের একজন পাপ কাজ করতো এবং অন্যজন সর্বদা ইবাদাতে লিপ্ত থাকতো। যখনই ইবাদাতরত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখতো তখনই তাকে খারাপ কাজ পরিহার করতে বলতো। একদিন সে তাকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে বললো, তুমি এমন কাজ থেকে বিরত থাকো। সে বললো, আমাকে আমার রবের ওপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার ওপর পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? সে বললো, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর দু'জনকেই মৃত্যু দিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি ইবাদতগুজার ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে? অথবা তুমি কি আমার হাতে যা আছে তার ওপর ক্ষমতাবানী ছিলে? এবং পাপীকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করো। আর অপর ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি বললেন, তোমরা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন! সে এমন উক্তি করেছে যার ফলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই বরবাদ হয়ে গেছে।[৪৯]

এ শাস্তির কারণ হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ত ও নির্ধারিত দাওয়াতি মানহাজ প্রত্যাখ্যান করে বিভিন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত মানহাজ অনুসরণ। এজন্য দেখা যায় যে, নূহ (আলাইহিস সালাম) মুসা (আলাইহিস সালাম), আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজীবন দাওয়াতী কাজ করেছেন, হুকুম লাগিয়ে মানুষদেরকে দূরে সরাননি।

এজন্য দেখা যায় যে, একজন বেদুইন মসজিদে পেশাব করে দিলেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ওপর কোনো হুকুম না লাগিয়ে তাকে বুঝিয়েছেন। এমনিভাবে সাহাবী মুয়াবিয়া বিন আল-হাকাম আস-সুলামি যখন নামাজে কথা বললেন, তখনও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ওপর হুকুম না লাগিয়ে তাকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু এ দ্বারা আমি এটা বুঝাচ্ছি না যে, কোনো বিধর্মী যদি ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ না করে তাকে কাফের মুশরিক বলা যাবে না।

আর বিশেষভাবে বর্তমান যুগের মুসলিম কমিউনিটির অবস্থা তো আরো খারাপ এবং আরো ভয়াবহ। কারণ তারা জানে না যে, সঠিক আকিদা কী? বিশুদ্ধ ইবাদত কী? সহীহ মানহাজ কী? শিরিক-বিদ'আত কী? যাতে তারা অজান্তে শিরক-বিদ'আত-খুরাফাতে, আল্লাহ দ্রোহিতায় ও অবাধ্যতায় পতিত হচ্ছে। এজন্য তাদের দ্বীনের শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক আবেগী দাঈকে দেখতে পাওয়া যায়– তারা ঐ সকল অজ্ঞ-মূর্খদের ওপর ঢালাওভাবে কাফের, ফাসেক, মুনাফিক, মুরতাদ ইত্যাদি ট্যাগ বা হুকুম লাগায়। অথচ তাদের কাছে যাননি, শিক্ষা দেননি, তাদের ওপর দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেননি (তাদের কাছে দলিল প্রমাণ পেশ করেননি)– এটা সম্পূর্ণ দাওয়াতের সঠিক মানহাজের পরিপন্থি।

উল্লেখ্য যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে উল্লেখিত মানহাজের খেলাফ করায় বিভিন্ন খারাপ দিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন:–

১। দাঈ হোক, আহ্বানকৃত ব্যক্তি হোক – সকলের শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ ও অনীহা।

২। তাদেরকে দেখা যায় যে, হুকুম লাগাতে ও আলোচনা সমালোচনায় পরনিন্দা গীবতচর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

৩। আহ্বানকৃত ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর বিভিন্ন হুকুম লাগানোর ফলে তারা প্রকৃত দ্বীন শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বা এদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বা অভক্তি বা ঘৃণা তৈরি হচ্ছে।

পরিশেষে বলবো, আমরা যারা মাঠে-ময়দানে দাওয়াতের কাজ করব তাদের উচিত– সচেতন হওয়া, দয়ালু হওয়া, যোগ্য-বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী হওয়া, ধৈর্যচ্যুত না হওয়া, মানুষদেরকে শিক্ষা প্রদান করা, দাওয়াত প্রচার-প্রসারের চিন্তা ধারা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদি ব্যতীত হুকুম না লাগানো; আর খেয়াল রাখা যে, আমাদের ওপর ফরজ হচ্ছে দাওয়াত-তাবলীগ, উপদেশ-নসিহা ইত্যাদি করা; আর বিচারের দায়িত্ব আল্লাহর। ❐❑

[৪৯] *সুনানে আবু দাউদ, হা : ৪৯০১*

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ধারা

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

১. ভূমিকা

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন মূলত মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ঐশী বিধানের আলোকে সাজানো ও রাসূল ﷺ-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাস্তবায়িত এক বাস্তবসম্মত ন্যায়ানুগ ও ইনসাফভিত্তিক বিধান। সামান্য হউক বা বেশি– পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনরা যে সম্পদ মৃত্যুর পূর্বে রেখে যাবেন, তাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও অংশ রয়েছে মর্মে আল-কুরআনে ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্প হউক বা বেশি হউক, এক নির্ধারিত অংশ।'[৫০] এ আহবান ও নির্দেশনা এমন সময় এসেছে যখন আরবের জাহিলী সমাজে নারীদের সম্পত্তিতে কোনো ধরনের অধিকার ছিলো না। সর্বপ্রথম সূরা নিসার ১১-১২ আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে সম্পত্তিতে পুরুষের সাথে নারীরও অধিকার ঘোষণার সূত্রপাত হয়। অবশেষে বিদায় হজ্বের আগে উত্তরাধিকারের সর্বশেষ বিধান হিসেবে সূরা নিসার ১৭৬ নং *কালালার* আয়াতের মাধ্যমে সে বিধানের পরিসমাপ্তি হয়। নিম্নে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে।

২.১ প্রাক ইসলামী যুগের সমাজব্যবস্থায় উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোনো জ্ঞান ছিলো না। ইসলামপূর্ব যুগে মক্কায় বা বৃহত্তর আরবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। তাই লেখাপড়ার প্রচলন বলতে গেলে ছিলই না। গোটা কুরাইশ বংশে নবী ﷺ-এর আবির্ভাবকালে মাত্র সতেরো ব্যক্তি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।[৫১] এমতাবস্থায় সে যুগে ঐ দেশে আইন পুস্তক বা সংকলন বলে কিছু থাকবে তা কল্পনাও করা যায় না। আরবের সিংহভাগ এলাকারই কোনো সুনিয়ন্ত্রিত সরকার ছিল না, তাই সেসব এলাকার আজকের মতো কোনো আইন পরিষদ বা ঐরূপ আইন প্রস্তুতকারী সরকারি সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না যার মাধ্যমে বিরোধসমূহের মীমাংসা এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধান করা যেতে পারে।[৫২] জাহিলিয়াতের যুগের আইন-কানূন, দিয়াত, উত্তরাধিকার প্রভৃতির অধিকার নিয়ন্ত্রিত ও মূল্যায়িত হতো। কোনটা হক আর কোনটা না-হক তা নির্ধারণে নিজেদের অধিকার অর্জন এবং যারা অধিকার কেড়ে নিতো তাদের থেকে তা ফিরিয়ে আনতে শক্তিমত্তাই প্রধান ভূমিকা পালন করতো। তারপর এ ব্যাপারে বড় ভূমিকা ছিল নানারূপ গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির। সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থার অবর্তমানে ঐগুলোই ছিল তাদের অবলম্বন। কন্যা সন্তানের মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকার ছিলো তখন কল্পনাতীত ব্যাপার। কারণ তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হয়ে যাযাবর রূপে বসবাস করতো। সামান্য বিষয়ে গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকতো। এ সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদের ধরে নিয়ে বিয়ে করতো। এই জন্যই আরবগণ কন্যা সন্তানের জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করতো এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পছন্দ করতো।[৫৩] কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হতো। পুত্র সন্তানের মতো কন্যা সন্তানের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। এই কারণে আরবগণ কন্যাদেরকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করতো।[৫৪] যেখানে কন্যা সন্তানের জন্ম এবং বেঁচে থাকাই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল সেখানে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকারের তো প্রশ্নই আসে না।

প্রাক-ইসলামী যুগে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের ওপর তৎকালীন সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বণ্টিত হতো।[৫৫] বিভিন্নভাবে আরবের জাহেলী পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ফুটে ওঠে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গের 'মাসায়েল' গুলোতে। যেখানে নারী বা কন্যা সন্তানকে অবহেলার

*সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)
সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

[৫০] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৭*

[৫১] *ফুতুহুল বুলদান, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮২), পৃ. ৪৮৫।*

[৫২] *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০১৯), পৃ. ১২৬।*

[৫৩] *আব্দুল খালেক, নারী ও সমাজ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১৭।*

[৫৪] *Rustum and Zurayk, History of the Arabs and Arabic Culture (Beirut, 1940), p. 36.*

[৫৫] *মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, মুসলিম পারিবারিক আইন পরিচিতি (ঢাকা : কামরুল বুক হাউজ, ২০০২), পৃ. ১৫৬*

দৃষ্টিতে দেখা হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়াজ-নীতির প্রচলন ছিল। এ সকল প্রথার অধিকাংশ ছিলো অযৌক্তিক, বৈষম্যমূলক এবং ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী। কারণ উত্তরাধিকারী হতে পারতো কেবল যাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো যোগ্যতা ছিলো।[৫৬] শুধু মৃতের বংশধররাই যে তার উত্তরাধিকারী হবে তেমন কোনো নিয়ম ছিলো না। তারপরও প্রাক ইসলামিক যুগের কিছু প্রথা মুসলিম আইনে গ্রহণ করা হয়। নাবালক বা নারী কিংবা নারীর মাধ্যমে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি মৃতের সম্পত্তির অধিকারী হতে না পারলেও কেবলমাত্র রক্ত সম্পর্কিত পুরুষ আত্মীয়গণই মৃতের সম্পত্তির অধিকারী হত। এদেরকে *আসাবাত* বা 'স্বগোত্রীয় ওয়ারিসী' বলা হত। এরা মাথাপিছু অংশ পেত। স্বগোত্রীয় ওয়ারিসী নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'নিকটতর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে'। ইসলামী আইনে 'নিকটতর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে' নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে কেবলমাত্র রক্ত সম্পর্কিত পুরুষ আত্মীয়গণের মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার নীতিটি বাদ দিয়ে প্রধানত নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছে, ক. নাবালক, অজাত শিশু নারী এবং নারীর মাধ্যমে সম্পর্কিত, ব্যক্তিকে ওয়ারিশ করা হয়েছে। খ. ওয়ারিসগণকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন- ১. অংশীদার ২. অবশিষ্টভোগী এবং ৩. দূরবর্তী আত্মীয়।[৫৭] ইসলাম আসার পূর্বে মহিলার প্রতি এই অবিচার করা হতো যে, স্বামী মারা গেলে তার (স্বামীর) পরিবারের লোকেরা সম্পত্তি ও সম্পদের মতো মহিলারও জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী হয়ে বসতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! জোর জবরদস্তি করে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়।'[৫৮] এভাবে অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হতো। সে নিজেই তাকে বিয়ে করতে পারতো। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোনো লোকের নিকট বিয়ে দিতে পারতো, আর সে তার বিয়ে বন্ধও করতে পারতো। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হতো।[৫৯] এমনকি নিজ ইচ্ছায় তার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাদের কোনো ভাই ও ভাইয়ের পুত্রের সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিতো। এমনকি সৎপুত্রও মৃত পিতার স্ত্রী (সৎ মা) কে বিবাহ করতো।[৬০] কন্যার উত্তরাধিকার, দেনমোহরের অধিকার, কিংবা তালাক কোনো কিছুতে মতামত প্রদান ও কোনো অধিকারেরও স্বীকৃতি ছিলো না। এক কথায় প্রাক ইসলামী যুগে উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকার থেকে নারী বঞ্চিত ছিল। সে সমাজে নারীর কোনো ধরনের অধিকার ছিল না; সামগ্রিকভাবে নারীদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়।[৬১] কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাদের অবস্থা কীরূপ হতো সে প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানিহেতু সে নিজ সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে। ... ... সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁটুতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতো নিকৃষ্ট।[৬২]

কন্যা সন্তানের ব্যাপারে সে সময়ের আরব সমাজের মনোভাব ছিলো অত্যন্ত জঘন্য। তারা কন্যা সন্তানকে পরিবারের জন্য বোঝা মনে করতো। কাজেই তারা তাকে মেরে ফেলাই শ্রেয় মনে করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'তোমাদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করবে না। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।'[৬৩] জাহিলি যুগের মিরাসী পদ্ধতিতে নারীগণ তাদের সম্পর্কের আত্মীয়গত উত্তরাধিকার পেতেন না। সাধারণত নিকটতম পুরুষগণ উত্তরাধিকার লাভে সমর্থ হতেন। কন্যা, শিশু, দুর্বল এবং অল্প বয়স্কদের কোনো উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না। অথচ এমন কিছু লোক উত্তরাধিকারী হতো, আল-কুরআনে উপর্যুক্ত বিধান যাদের মীরাস থেকে বঞ্চিত করেছে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজে এই দিকে মনযোগ প্রদান এবং তা দমন

[৫৬] *ইমামুদ্দীন ইসমাইল ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (মিসর : দারুত তাকওয়া লিত-তুরাছি, ১৯৭৮), পৃ. ৫৩১*

[৫৭] *অধ্যক্ষ মো : আলতাফ হোসেন, ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন সহায়িকা, (ঢাকা : সিটি ল' বুকস, ২০০৭), পৃ. ৩১*

[৫৮] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৯*

[৫৯] *Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Woman in Islam (Lahore : Islamic Publication Ltd. 1879), p. 15.*

[৬০] *আব্দুল হামিদ ফাইযী আল মাদানী, ফারায়েজ শিক্ষা, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ-৭; ড. মোস্তফা আস সাবায়ী, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলা অনু. আকরাম ফারুক (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮), পৃ. ১৬*

[৬১] *সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম (কলিকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫), পৃ. ৩২২*

[৬২] *সূরা আন-নাহল আয়াত : ৫৮, ৫৯*

[৬৩] *সূরা ইসরা, আয়াত : ৩১*

না করা পর্যন্ত এই নিদারুণ ঘৃণ্য প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো।[৬৪] জাহিলিয়াতের যুগে আরব দেশে তিনটি সূত্রে উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিলো। আর তা হলো–

২.১.১ বংশধর হওয়া

জাহেলী যুগে বংশধর হওয়া ছিলো উত্তরাধিকার সম্পত্তির হকদার হওয়ার প্রধান মানদণ্ড। তা পুরুষ বংশধরদের জন্য নির্দিষ্ট ও সীমিত ছিল, যারা ঘোড়ার সাওয়ার হতে পারতো, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে পারতো এবং গণীমতের মাল নিয়ে আসতে সক্ষম হতো। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের মালিকানা সে সকল সবল ও শক্তিশালী পুরুষলোকদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। পক্ষান্তরে ইসলামও বংশধরদের জন্য উত্তরাধিকারী হওয়ার নীতি ঘোষণা করেন, যেমনটি জাহেলি যুগে বর্তমান ছিল। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ 'এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পত্তি রেখে যায় আমি তার প্রত্যেকটির হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।[৬৫] শাইখ তানতাবী জাওহারী (১৮৭০-১৯৪০ হি.) এ আয়াতের শাব্দিক ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন : "(প্রত্যেক) পুরুষ এবং নারীর জন্য (আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি)। তারা চাচার সন্তান অথবা ভাই অথবা অন্যান্য আত্মীয়বর্গ। (পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যা রেখে যায়) তারা তাদের পরিত্যক্ত সেসব সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে।[৬৬]"এখানে নারী-পুরুষ এবং পুত্র-কন্যাসহ সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়। যা ছিল জাহেলি যুগে খণ্ডিত পর্যায়ে। জাহেলি যুগের প্রচলিত প্রথা ভেঙে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নারীদের অধিকার প্রদানের বাণী নিয়ে ইসলাম আগমন করে। এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হলো *মাওলা* ও *মাওয়ালী*। যেখানে শক্তিমত্তা ও শারীরিক সক্ষমতাই সম্পদের হকদার হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নয়। ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবিক চেতনা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সুন্দর এক নতুন সমাজ বিনির্মাণের মহান চেতনায় নারী-পুরুষ সকলের অধিকারের ঘোষণা আসে।[৬৭] মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থাপনার এ সুনির্দিষ্টকরণ প্রক্রিয়া মহান প্রভুর পক্ষ থেকে দেওয়া এক নির্দেশনা। যাতে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কাউকে বিশেষ কোনো কারণে বঞ্চিত করা হয়নি।

২.১.২ পালকপুত্র বা মুখ ডাকা পুত্র

জাহেলী যুগে অন্য ব্যক্তির পুত্রসন্তানকে নিজের মুখ-ডাকা পুত্র বা পালিত পুত্র বানাবার রেওয়াজ ব্যাপকভাবে ছিলো। ফলে সে ঔরসজাত পুত্রের মতোই উত্তরাধিকারী হতো। ইসলাম জাহেলি যুগের মুখ-ডাকা সন্তানের উত্তরাধিকার নাকচ করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মুখ-ডাকা পুত্রকে তোমাদের (প্রকৃত) পুত্র বানাননি।'[৬৮]

২.১.৩ চুক্তিভিত্তিক উত্তরাধিকার

মৈত্রী ও চুক্তি- একজন অপরজনকে বলতো, আমার রক্ত তোমার রক্ত বা আমার ধ্বংস তোমার ধ্বংস। অর্থাৎ আমার রক্তপাত হলে তোমার রক্তপাত হবে। আর তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে, আমি তোমার উত্তরাধিকারী হবো। আমার কারণে তোমাকে খোঁজ করা হবে এবং তোমার কারণে আমাকে তালাশ করা হবে। এভাবে দুইজন লোক পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হলে পরে একজন অপরজনের পূর্বে মারা গেলে জীবিত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তাই পেতো যা শর্ত করা হতো। ইসলাম জাহেলি যুগের ন্যায় চুক্তিভিত্তিক উত্তরাধিকার প্রথমে স্বীকার করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও ওয়াদা রয়েছে তাদের অংশ তোমরা তাদের দাও।[৬৯] এভাবে তারা ইসলামী যুগেও পরস্পরের পরিত্যক্ত মোট সম্পদের এক ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হতো। এ অংশ প্রদানের পর অন্য উত্তরাধিকারীরা অবশিষ্ট সম্পদ থেকে তাদের প্রাপ্য লাভ করত। এরপর এ নিয়ম রহিত করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং রক্ত সম্পর্কের অধিকারীরা একে অপরের অধিক নিকটবর্তী।'[৭০] এরই মাধ্যমে জাহেলি যুগের মীরাসী পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন আঙ্গিকে ইসলামী উত্তরাধিকার আইন নতুনত্ব লাভ করে।

---

[৬৪] *This revolting custom prevailed extensively until it was supressed by Muhammad peace be on him'. O'leary, De Lacy, Arabia Befor Muhammad, (London : 1927), p. 202.*

[৬৫] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৩*

[৬৬] *শাইখ তানতাবী জওহারী, আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম, ৪র্থ সংস্করণ, ৩ খণ্ড (বৈরুত : দারু ইহইয়াইত্ তুরাসিল আরবি, ১৯৯১), পৃ. ৩৮।*

[৬৭] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৩*

[৬৮] *তদেব*

[৬৯] *তদেব*

[৭০] *সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৬*

২.২ প্রাক ইসলামী যুগে উত্তরাধিকার আইন প্রসঙ্গ

ইসলামপূর্ব যুগে মক্কায় লেখাপড়ার প্রচলন বা গোটা আরবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে ছিলই না। রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবকালে মাত্র সতেরো ব্যক্তি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন।[৭১] সুতরাং বলাই যায় ঐ দেশে আইন পুস্তক বা সংকলন বলে কিছুই ছিল না। জাহেলী যুগের কোনো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বলে কথিত কিছু বাণী, অভিমত ও বিধান অথবা দক্ষিণ আরবের ইসলামপূর্ব যুগের রাজা-বাদশাহদের ব্যবসা ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিধান বা ব্যবসা-বাণিজ্য ও হত্যা সংক্রান্ত বিধি-বিধান কিছুটা থাকলেও ঐগুলোকে সাধারণত আমরা আইন বলতে যা বুঝে থাকি ঠিক ঐরূপ আইন বলা চলে না। ঐগুলো বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সাময়িক বিধান মাত্র।[৭২] আইন-কানুন তাদের বিভিন্ন জনপদ জাতি-গোষ্ঠীর রঈসদের অভিমত অনুসারে তৈরি হতো।[৭৩] আরবদের মধ্যে হক বা অধিকার বলতে বুঝাতো শক্তিমানের বাহুবল ও অধিকার; যার থাকতো অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল, যা প্রয়োগ করে সে তার স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে এবং অত্যাচার অবিচারের সম্মুখীন হলে আত্মরক্ষায় পারঙ্গম ছিল। এই শক্তির ভিত্তিতেই জাহিলিয়াতের যুগের আইন-কানুন, দিয়াত, উত্তরাধিকার প্রভৃতির অধিকার নিয়ন্ত্রিত ও মূল্যায়িত হতো।[৭৪] যুল-মাজাসিদ নামে মশহূর 'আমির ইবনে জুশাম ইবনে গানাম ইবনে হাবীব সর্বপ্রথম বিধান দিয়েছিলেন কন্যা সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার প্রদানের, অথচ আরবদের মধ্যে কেবল পুত্র সন্তানদেরকেই উত্তরাধিকার প্রদানের প্রচলন ছিল। আর যুল-মাজাসিদ সর্বপ্রথম কন্যা সন্তানদেরকে পুত্র সন্তানদের অর্ধেক হারে উত্তরাধিকার প্রদানের বিধান প্রবর্তন করেন। পরে ইসলাম তার এ মতকে বহাল রাখে।[৭৫] ইসলামপূর্ব যুগে তাদের মতো করে বিচার ব্যবস্থা চালু হয় জুরহুমী যুগে মক্কা শহরে; বিখ্যাত হরবে ফিজারের পর এটি পুনরুজ্জীবিত হয়। এসব বিচার মীমাংসার বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার বা তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা, নিজেদের অসমীচীন গর্ব প্রকাশ, উত্তরাধিকার, কুয়ো বা ঝর্ণাধারা সংক্রান্ত বিরোধ থেকে শুরু করে নরহত্যা পর্যন্ত সবকিছুই থাকতো।[৭৬] জাহেলী যুগে বংশের ভিত্তিতে নারী ও শিশু উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করত না। যুদ্ধ ও গণীমতের মাল আহরণ করতে সক্ষম পুরুষরাই উত্তরাধিকারী হত। সে কালে যারা শত্রুর বিরুদ্ধে বা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরতে পারত তারাই উত্তরাধিকার লাভ করত। নারীরা অস্ত্র ধরতে পারত না। বিধায়, তারা উত্তরাধিকার পেত না।[৭৭] প্রাক ইসলামিক আরবে নারীর কোনো নিজস্ব সত্ত্বা ছিল না। পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসাবে গণ্য হত নারী। তবে কোনো আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারো কাছ থেকে দান, ওয়াসিয়াত বা বিক্রয় প্রক্রিয়ায় সম্পত্তি পেতে পারত।[৭৮] কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে নারী কোনো কিছুই পেত না।

২.৩ নবী যুগের আইন, বিচার ব্যবস্থা ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

৬১০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বশেষ প্রত্যাদেশ নিয়ে রাসূল ﷺ নবুয়াত লাভের পর থেকে আরবে তথা গোটা বিশ্বে এক নবযুগের সূচনা হয়। রাসূল ﷺ-এর নবুয়্যাত লাভের পরও বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাহেলী যুগের রীতি চালু ছিল। মক্কায় উত্তরাধিকার আইনের রাসূল কর্তৃক কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে রাসূল ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পর তিনি কেবল মুসলমানদেরই নয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ইয়াসরিববাসীরই নেতা এবং প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। মদীনার স্বল্প পরিসরে হলেও তিনি ছিলেন ঐ নগর রাষ্ট্রের প্রধান শাসক এবং বিচারক। তিনি মুসলিমদের তো বটেই অমুসলিম আহলে কিতাবদের মোকাদ্দমাসমূহের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত আইন (পার্সোনাল') অনুসারে ফায়সালা দিতেন। তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এমন অন্তত দুটি মামলার কথা উল্লেখ করে থাকেন যেগুলোতে নবী ﷺ তাওরাতের বিধান অনুসারে

---

[৭১] *ফুতুহুল বুলদান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ. ৪৮৫*

[৭২] *ড. জাওয়াদ আলী, আল-মুফাস্সাল ফী তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম (বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত, ১৯৯৩), ২য় সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৯-৪৭০*

[৭৩] *'রঈস' শব্দের অর্থ গোত্র প্রধান*

[৭৪] *সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান (ঢাকা : ইফাবা, ২০১২), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৬*

[৭৫] *মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব, আল মুহাব্বার, পৃ. ২৩৬*

[৭৬] *তারীখে ইয়াকূবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯*

[৭৭] *আব্দুর রহিম, মুহামেদান জুরিস প্রুডেন্স (১৯৬৩),১৫; এম হাবিবুর রহমান, "দি রোল অব কাস্টমস ইন দি ইসলামিক ল অব সাকসেশন", ইসলামিক এন্ড কমপ্যারেটিভ ল কোয়াটারলি, খণ্ড ৮, নং ১ দিল্লী, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৪৮*

[৭৮] *মাওলানা আব্দুর রহিম, নারী, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১২*

ইয়াহূদীদের মামলা নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন।[৭৯] তাফসীরে জাসসাসের বর্ণনায় এসেছে–

ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আতা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ বিষয়টি অবহিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে বিয়ে, তালাক কিংবা উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি-নীতির ওপরই জীবন-যাপন করতে অনুমতি দিয়েছিলেন? তিনি বললেন এটাই আমরা জেনেছি।[৮০]

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করত পরস্পরিক চুক্তি[৮১] এবং কাউকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করা। ইসলামের আগমনের পরও কিছুদিন যাবত এ নিয়মই বিদ্যমান ছিল। পরে তা 'রক্ত সম্পর্কের উত্তরাধিকারীরা একে অপরের অধিক নিকটবর্তী' এ আয়াতের মাধ্যমে রহিত করা হয়।[৮২]

২.৪ মদীনায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের বিকাশ

'যখন মুহাজিররা মদীনায় আগমন করেন তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনসার এবং মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এর ফলে মুহাজির তার আনসার ভাইয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো।'[৮৩] আর মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় হিজরত না করলে স্বাভাবিকভাবেই তার উত্তরাধিকার থেকে সে বঞ্চিত হতো। এ আইনের লক্ষ্য খুব সম্ভব এই ছিলো যে, সমস্ত মুসলমান মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসুক। আল-কুরআনে এসেছে–

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, দেশত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশত্যাগ করেনি, তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে।[৮৪]

অতঃপর উত্তরাধিকার আইনকে ব্যাপকতর করা হলো। হিজরতের মধ্যদিয়ে পুত্ররাও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলো। তখন পর্যন্ত পিতা-মাতা কিংবা কন্যাদের জন্য কোনো অংশ নির্ধারণ করা হয়নি। ইবনে আব্বাস বলেন, 'ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই নিয়ম ছিলো যে, শুধু সন্তান সন্ততিরাই সম্পত্তির অধিকারী হতো।'[৮৫] এ নির্দেশটি নিম্নলিখিত আয়াতের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওয়াসিয়াত করা বিধিবদ্ধকরা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেজগারদের জন্য ইহা অবশ্য কর্তব্য।'[৮৬] এ বিধান দেওয়া হয়েছিল যখন উত্তরাধিকার স্বত্ব বণ্টন সম্পর্কিত কোনো আইন নির্দিষ্ট ছিলো না। সে সময় অন্তিম নির্দেশ বা ওয়াসিয়াত-এর মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের জন্য অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। যাতে তার মৃত্যুর পর বংশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না হতে পারে এবং কোনো হকদারের হকও নষ্ট না হয়। এ আয়াতের 'এ হক আদায় করা হতে থাকলে মীরাসের ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং যেগুলো আজকের মানব সমাজে অনেক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে তার মীমাংসা অতি সহজেই হয়ে যেতে পারে যেমন দাদা ও নানার জীবদ্দশায় যেসব নাতি-নাতনীর বাবা-মা মারা যায় তাদের বিষয়টি (এদের এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত থেকে সহজেই অংশ দান করা যায়)।'[৮৭] কিন্তু বদর, উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে ওয়াসিয়ত করে যেতে পারেননি, এমন বহু সাহাবী শহীদ হন। ফলে তাদের সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করা হবে সে প্রশ্ন দেখা দেয়। আউস বিন সাবিতের বিধবা স্ত্রী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর

---

[৭৯] *প্রথম মোকাদ্দমার জন্যে দেখুন : সহীহ বুখারী, ইবনে হিশাম, পৃ. ৯৩-৯৫; আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২; মাসউদী আততাম্বীহ, পৃ. ২৪৭। দ্বিতীয় মোকাদ্দমার জন্যে দেখুন : তাফসীর তাবারী, ২৭ খ., পৃ. ৪৪-৫০; বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ, দারেমী এবং মুসনাদে আহমদ হাম্বলেও ঘটনাটি বর্ণনা রয়েছে।*

[৮০] *আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী আর রাযী আল-জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন, খ. ১১. (লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যা, ১৯৭৮) পৃ. ৯০*

[৮১] *'আর যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ তাদের অংশ দিয়ে দাও' আল-কুরআন, ৪ :৩৩। এ আয়াত সম্পর্কে শায়বান রা. কাতাদার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, জাহেলী যুগে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে এ কথা বলে চুক্তি করত যে, আমার রক্ত যেন তোমার রক্ত এবং আমার সম্মানহানি যেন তোমার সম্মানহানী। আমি তোমার উত্তরাধিকারী হব। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে। এভাবে তারা চুক্তিবদ্ধ হত। ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬), পৃ. ৪৯৭।*

[৮২] *সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৬*

[৮৩] *নাসিরুদ্দীন আলবায়যাভী, আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাভীল (তাফসীরে বায়যাভী), প্রথম খণ্ড, লেবাবনন : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৮), পৃ. ৩২৪*

[৮৪] *সূরা আনফাল, আয়াত : ৭২*

[৮৫] *সহীহ বুখারী*

[৮৬] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮০*

[৮৭] *মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, আল কুরআনের পয়গাম, ১ম খণ্ড, (ঢাকা : সৌরভ বর্ণালী প্রকাশনী, ২০১৮) পৃ. ৮৮।*

খিদমাতে নিবেদন করেন যে, তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে অথচ তিনি এবং তার ছোট মেয়েরা আউসের সম্পত্তি থেকে কিছুই পাননি। কেননা পুরো সম্পত্তিই মৃতের ভাই নিয়ে গেছে।[৮৮] কোনো কোনো বর্ণনায় সা'দ বির রাবীর দুই কন্যাসহ তাঁর স্ত্রী রাসূল ﷺ-এর কাছে উহুদ যুদ্ধে শহীদ স্বামীর মীরাসী সম্পত্তি কন্যাদের চাচা গ্রহণের বিষয়ে আপত্তি জানাতে আসলে মীরাসী বিধান প্রবর্তিত হয়।[৮৯] মৃত ব্যক্তির নিজের সন্তানকে বঞ্চিত করে মৃতের সম্পদ নিয়ে নেওয়া বা কেবল পুরুষরা সম্পদ গ্রহণ করা তাদের কাছে সাধারণ ব্যাপার ছিলো। তারপরই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বণ্টনের বিস্তারিত বর্ণনা নিয়ে সর্বপ্রথম উহুদ যুদ্ধের পরই উত্তরাধিকার আয়াত অবতীর্ণ হলো। যেমন জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন : রাসূল ﷺ আমাকে দেখার জন্য এলেন। তার আগমন মুহূর্তে আমি চেতনাহীন ছিলাম। রাসূল ﷺ তখন ওযু করেন এবং ওযু করার পর পাত্রে যে পানি বেঁচে ছিল তা আমার ওপর ছিটিয়ে দেন। ফলে আমার চেতনা ফিরে আসে। আমি তখন রাসূলের কাছে নিবেদন করি, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আমার সম্পত্তির কী করবো? কীভাবেই বা এগুলোকে বণ্টন করে যাবো? রাসূল ﷺ কোনো উত্তর দিলেন না, এমন কি উত্তরাধিকার সম্পত্তি সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো।'[৯০]

অবতীর্ণ হলো মীরাসের বিস্তারিত বিধানের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত। আল-কুরআনে উক্ত অবতীর্ণ সূরা নিসার ৬-৮ এবং ১১-১৪ নং ইসলামী উত্তরাধিকার আয়াত দ্বারা জাহিলি আরবে আবহমানকাল থেকে চলে আসা প্রাচীন মিরাসী পদ্ধতির গোটা ব্যবস্থাকে বাতিল ও নাকচ করে দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মিরাসী বিধান উপস্থাপন করে।[৯১] তখন অনেক সাহাবী এর প্রতিবাদ করেন। আল-আউফি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণণা করেন, যখন আল্লাহর নবী এই আয়াতের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষ, নারী ও পিতা-মাতার অংশ বর্ণনা করেন, তখন কেউ কেউ তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, নারীকে চারের এক অথবা আটের এক, মেয়েকে দুয়ের এক, এমনিভাবে ছোট শিশুকেও পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ দেওয়া হচ্ছে, অথচ তাদের কেউ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না। তারা কিভাবে সম্পত্তি পেতে পারে? অতএব, তোমরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকো, কোনো কথা বলো না, সম্ভবত রাসূল ﷺ তা ভুলে যাবেন অথবা আমরা তাঁকে পরিবর্তন করার জন্য বলব। অতঃপর তারা রাসূল ﷺ এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! পিতার মৃত্যুর পর কন্যা যদি একজন হয় তাকে অর্ধেক সম্পত্তি দেওয়া হয় অথচ সে অশ্বারোহণ করে যুদ্ধের মাঠে জিহাদে অংশগ্রহণ করে না। একইভাবে শিশুকেও মীরাসী সম্পত্তি দেওয়া হয়, যে কোনো কাজেই আসে না।[৯২] এ থেকে বুঝা যায় সম্পত্তিতে নারীদের অংশ নিশ্চিতের প্রক্রিয়া সহজ ছিল না।

মীরাসী বিধান সম্বলিত সূরা নিসার আয়াতগুলোতে এ প্রথম মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের উত্তরাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ স্বীকৃতি সম্বলিত সম্পত্তিতে নারীদের অংশ প্রদানের মহান আল্লাহর ঘোষণায় তৎকালীন গোটা সমাজ পরিবেশটাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। অনেক পুরুষ এই আদেশ শুনে শঙ্কা প্রকাশ করে পরস্পর নানা রকম কথাবার্তা বলতে লাগলো। কেউ কেউ বলল– 'কী অবাক কথা! এখন স্ত্রীরা চতুর্থাংশ পাবে, কন্যাদেরকে অর্ধেকাংশ দিতে হবে আর ছোট ছোট সন্তানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দিতে হবে। অথচ তারা কেউ যুদ্ধ করে না। আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদও কুড়িয়ে আনে না।'[৯৩] অর্থাৎ কেউই কন্যা বা নারীদের সম্পত্তিতে অংশীদার করার আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাজি বা সন্তুষ্ট ছিল না। মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদেরকে তৈরি করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা ধীরে ধীরে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করেন। অবশেষে উত্তরাধিকার আইন এবং এর বাস্তবায়ন আরো ব্যাপকতা লাভ করলো। নারী-

[৮৮] *তাফসীরে রূহুল মায়ানী; আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা ও ইবনে সাদ, পৃ. ২৮২।*

[৮৯] *আহমাদ, তিরমিযি, আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ।*

[৯০] *সহীহ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১৯), পৃ. ১৪৮।*

[৯১] *এ আয়াতগুলো ওহুদের যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়। এ লড়াইয়ে ৭০ জন মুসলিম শহীদ হন। এ দুর্ঘটনার কারণে শহীদদের মীরাস কিভাবে বণ্টন করা হবে, এ প্রশ্ন বহু পরিবারের সামনে প্রকট হয়। এই আয়াতগুলোতে এ সমস্যার সমাধান দেখা যায়। গাজী শামসুর রহমান, ফারায়েজ আইন (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০১), পৃ. ৭।*

[৯২] *সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন, অনুবাদ : হাফিজ মুনির উদ্দিন আহমদ, (লণ্ডন : আলকুরআন একাডেমি, ২০০১), খ. ৪, পৃ. ৫৯; ইবনু আবি হাতিম, আত-তাফসীর, (লেবানন : দারুল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ), খ. ৩, পৃ. ৮৮২; ইবনু জারীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ানি ফী তাফবিলীল কুরআন (বৈরুত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০০), খ. ৭, পৃ. ৩২।*

[৯৩] *আল বাহি আল খাওলী, অনুবাদ, মোহাম্মদ নূরুল হুদা, নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় (ঢাকা : পিস পাবলিকেশন, ২০১২), পৃ. ১৮৪।*

পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ– নির্বিশেষে সকলে নিজেদের অধিকার প্রাপ্ত হলো মৃতের উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে। ইতোমধ্যে ইসলামের বিভিন্ন বিধান ও ধর্ম চর্চার প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে। মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি মমতাপূর্ণ মানসিকতায় ইসলামের সকল বিধান ও নির্দেশনা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি এসে গেছে। এর মধ্যে বিদায় হজ্জের যাত্রা শুরু হলো। মীরাসী সর্বশেষ বিধান জারী করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হলো। মানুষ হিসেবে নারী বা কন্যা সন্তান এখন মুসলিম আরবীয় সমাজে অনেক মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে সূরা নিসার কালালার আয়াত (৪:১৭৬) অবতীর্ণ হয়ে কন্যা সন্তানের উপস্থিতিতে মৃতের ভাই-বোনের মীরাসী সম্পত্তির অধিকার সীমিত করা হলো। এ পর্যায়ে কোনো সাহাবী পুত্রের মতো কন্যা সন্তানের মূল্যায়নে প্রশ্ন তোলেননি। যেভাবে প্রশ্ন তুলেছিল উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী প্রথম মীরাসী বিধান (৪:১১-১২) প্রবর্তনের সময়। বিদায় হজ্বের কিছু সময় পূর্বে মীরাসী সর্বশেষ আইনের (*কালালা* সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণের) মাধ্যমে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের পূর্ণতা দিয়ে সকলের অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে এ আইন পরিপূর্ণতা পায়। এ পর্যায়ে বিধান জারি হলো যে, সন্তান থাকলে মৃতের ভাই-বোন কোনোক্রমেই উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাবে না। চাই সেই সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা– এ ঘোষণাই '*কালালা*' সংক্রান্ত আয়াতে আসলো। এর মাধ্যমেই মৃতের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আল-কুরআনের বিধান প্রদান শেষ হলো। বিদায় হজ্বের কিছু দিন পূর্বে রাসূলের নবুয়াতী জিন্দেগীর সর্বশেষ পর্যায়ে এ *কালালা* সংক্রান্ত আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।

রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় মুসলমানদের মধ্যে কোনো শ্রেণি-উপশ্রেণি ছিল না। রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর নানা শ্রেণি- উপশ্রেণি জন্ম নেয়।[৯৪] মুসলমানগণ প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। সুন্নি ও শিয়া।[৯৫] মুসলিম আইনের বিভিন্ন শাখায় সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সুন্নিদের মাঝে বেশ কিছু মাযহাব রয়েছে। এ মাযহাবের ফকীহগণ উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আলোচনাকালে তাদের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়কে কিতাবুল ফারায়েজ তথা ফারায়েজ অধ্যায় নামে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন।[৯৬] কোনো কোনো ফিকাহবিদ ফিকহ এর গ্রন্থ থেকে আলাদা করে 'ফারায়েজশাস্ত্র' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৯৭] হিজরী দ্বিতীয় শতকে ফিকহী মাসআলা বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ণের সূচনাকাল থেকেই-এ ধারারও যাত্রা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের দিকে যারা ফারায়েজশাস্ত্র সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে ইবনে শুবরুমা, ইবনে আলী লায়লা ও আবু সাওর উল্লেখযোগ্য।[৯৮] উক্ত দুই শতকে রচিত ফিকহ গ্রন্থাবলীতে ফারায়েজ সম্পৃক্ত কোনো আলোচনা ছিল না। অপরদিকে হাদীস গ্রন্থাবলীতে সাধারণ ফিকহী বিধি-বিধানের সাথে ফারায়েজের বিধি-বিধানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলীতে ফারায়েজের একটি করে অধ্যায় রয়েছে। (চলবে) ❐❑

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

(সহীহ বুখারী, হা : ৫০২৭)

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ১ দিনও সিয়াম পালন করে আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে ৭০ বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।

(সহীহ বুখারী, হা : ২৮৪০)

৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কোনো বান্দা যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সেজদা দেয় আল্লাহ এর বিনিময় একটি নেকি লিখে দেন এবং একটি গুনাহ মুছে দেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

(সহীহ মুসলিম, হা: ১১২১)

[৯৪] *মুহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিন, মুসলিম বিবাহ ও বিধিবদ্ধ আইন (রাজশাহী: এম. ওমর ফারুক, ১৯৯৮), পৃ. ২৬।*

[৯৫] *৬৩২ খ্রি. রাসূল সা. এর মৃত্যুর পর যারা পর্যায়ক্রমে হযরত আবুবকর রা., হযরত ওমর রা., হযরত উসমান রা. ও হযরত আলী রা. কে খলিফা হিসাবে মানে, তারা সুন্নি সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। অপরদিকে রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর যারা হযরত আলী রা. কে ইসলামের একমাত্র খলিফা হিসেবে মেনে নেয়; তারাই পরবর্তীকালে শিয়া সম্প্রদায় নামে আত্মপ্রকাশ করে।*

[৯৬] *নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, (প্রকাশক : আলমাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ), পৃ. ২; আল-আযবুল ফায়েদ, খ. ১, পৃ. ৮; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৬৫।*

[৯৭] *ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-২, ইসলামের পারিবারিক আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ ল' রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬), পৃ. ৪৯৪।*

[৯৮] *তদেব।*

মুক্তমনা বনাম সুস্থ ভাবনা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(পর্ব-৪)

❖ **নাস্তিকতার সূচনা ও বিস্তার :** নাস্তিক্যবাদ বা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার ধারণা সাম্প্রতিক কোনো বিষয় নয়। পৃথিবীর প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মাঝেও নাস্তিকতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

তবে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দাবি অনুযায়ী নাস্তিকতার সূচনা হয়েছে ১৬শ শতাব্দীর পরে এবং তা শক্তিশালীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ১৮শ শতাব্দীর দিকে।

এ ধারণাটি আংশিক সত্য ও আংশিক অসত্য বলে মনে হয়। কারণ কুরআন প্রদত্ত তথ্য মতে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করার ধারণাটি আরো অনেক প্রাচীন।

কুরআনুল কারীমের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী হলেন আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহাস সালাম। সুতরাং পৃথিবীর সমগ্র মানুষদের আদি পিতামাতা তারা দু'জনই।

আর তারা দু'জনই তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি আদম আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দশ প্রজন্মের সকলেই তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

كان بين آدم و نوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق.

আদম এবং নূহ আলাইহিস সালাম-এর মাঝে দশ প্রজন্ম ছিল তাদের সকলেই সত্য দীনের ওপর অবিচল ছিল।[৯৯]

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত নাস্তিকতা বা স্রষ্টার অস্তিত্বে অস্বীকার করার কোনো ধারণা প্রচলিত ছিলো না। নূহ আলাইহিস সালাম-এর পরবর্তী প্রজন্ম থেকে শিরক এবং নাস্তিক্যবাদের প্রথম প্রচলন হয়। কারণ নূহ আলাইহিস সালাম-এর কওমের লোকেরা ছিলো মর্তিপূজক।

তিনি যখন তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন তখন তাঁর কওমের লোকেরা বললো :

﴿لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

তোমরা তোমাদের উপাস্যগুলোকে পরিত্যাগ করো না, এবং ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুস ইয়াউক্ব ও নাসরকে ও পরিত্যাগ করো না।[১০০]

এগুলো ছিলো নূহ আলাইহিস সালাম-এর কওমের লোকদের উপাস্য। এ থেকে বুঝা যায় যে, নূহ আলাইহিস সালাম-এর কওমের লোকেরা একত্ববাদ পরিহার করে বহুত্ববাদের ধারণার জন্ম দেয়। উল্লেখ যে, নূহ আলাইহিস সালাম-এর চারজন পুত্র ছিল। যথাক্রমে : সাম, হাম, ইয়াফিস এবং কিনআন। তন্মধ্যে তিনজন (সাম, হাম ও ইয়াফিস) ছিল মুসলিম, বাকী একজন তথা কিনআন ছিল কাফের বা অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।[১০১]

কিনআন সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের ভাষ্য-

﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾

(কিশতিতে আরোহণ করার পর) নূহ আলাইহিস সালাম তার পুত্রকে যে পৃথক ছিলো, ডেকে বললেন, হে বৎস! আমার সাথে (কিশতিতে) আরোহণ করো এবং অস্বীকারকারীদের সঙ্গী হয়ো না। সে বললো : আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।[১০২]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, নূহ আলাইহিস সালাম-এর ছেলে কিনআম কারো মতে ইয়াস সে প্লাবন থেকে বাঁচার জন্য নূহ আলাইহিস সালাম-এর ডাকে তথা একত্ববাদের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, আবার প্লাবন থেকে বাঁচার জন্য সেই সময়ের প্রচলিত উপাস্যগুলোর কোনো একটির নামও উচ্চারণ করেনি। যেটা স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাসের প্রমাণ বহন করে।

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মূর্তিপুজা ও নাস্তিকতার ধারণা সমসাময়িক সময়কাল থেকেই শুরু হয়েছে।

যার প্রথম সূচনা আদম আলাইহিস সালাম-এর দশ প্রজন্মের পরবর্তী সময় তথা নূহ আলাইহিস সালাম-এর কওম থেকে হয়েছে।

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৯৯] মুস্তাদরাক আলা আস-সহীহাইনি-২/৪৮ পৃ., হা : ৩৬৫৪

[১০০] সূরা আন-নূহ, আয়াত : ২৩

[১০১] আল-বিদায়া, ১/৭৩ পৃ.

[১০২] সূরা হুদ, আয়াত : ৪২-৪৩

এরপর বিভিন্ন সময়ের জালিম বাদশাদের মাঝে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন : বাদশা নমরুদ।

বাদশা নমরুদ ছিলো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর সময়কার জালিম ও স্বৈরাচারী অহংকারী শাসক। যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো না বরং নিজকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রব বলে দাবি করতো। আল্লাহ তা'আলা উক্ত স্বৈরাচার অবিশ্বাসীর কথা কুরআনুল কারীমে তুলে ধরে বলেন :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রব সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বললেন : আমার রব তো তিনিই যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তখন সে বললো : আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ পূর্ব দিক হতে সূর্যকে উদয় করান, তুমি সেটাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও তো।[১০৩]

এখানে নমরুদের কথা :

অর্থাৎ আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই' এর অর্থ দাঁড়ায় সে নিজেকে জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা মনে করতো কিংবা নিজকে সর্বময় ক্ষমতাশালী রব বলে দাবি করছে। হাফিয ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখিত স্বৈরাশাসকদের ব্যাপারে বলেছেন :

هو نمرود بن كنعان بن كوش بن سام.

উক্ত স্বৈরাচার বাদশা হলো নমরুদ বিন কানআন বিন কুশ বিন সাম বিন নূহ।[১০৪]

[১০৩] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৫৮*
[১০৪] *ইবনে কাসীর- ১/৫৮৬ পৃ. , আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া- ১/১৪৮ পৃ.*

কারো মতে, নমরুদ ছিলো কুশ বিন হামের ছেলে। অর্থাৎ, নূহ আলাইহিস সালাম এর নাতির ছেলে।[১০৫]

নমরুদেরই সমসাময়িক অথবা তার পরবর্তী প্রজন্ম ছিলো আদ জাতি, এরা ছিল সাম তথা নমরুদের বাবা অথবা দাদা কুশ এর সহোদর ইরামের বংশধর। ইরামের নাতী আদ বিন উজ এর নামানুসারে এদেরকে কওমে আদ বা আদ জাতি বলা হয়।[১০৬]

কুরআনুল কারীমে সূরা মু'মিনুনে আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালাম এর আলোচনার পরপরই এ আদ জাতির বর্ণনা পেশ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

অতঃপর তাদের পর আমরা অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছিলাম ; এরপর আমরা তাদের মধ্য থেকেই একজনকে তাদের কাছে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন : তোমরা এক আল্লাহর এবাদত করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মা'বুদ নাই। তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না ?[১০৭]

এ জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলা হুদ আলাইহিস সালাম কে রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন আর হুদ এবং আদ সম্প্রদায় একই বংশধর ছিল। অর্থাৎ : নূহ আলাইহিস সালাম-এর ছেলে সামের বংশধর। হুদ আলাইহিস সালাম যখন তার স্বগোত্রীয় সম্প্রদায়কে এক আল্লাহর এবাদতের দিকে আহ্বান করলেন তখন তার সম্প্রদায়ের নেতারা একত্ববাদের আহ্বান প্রত্যাখান করে বললো :

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۞ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ۞ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ۞ هَيْهَاتَ

[১০৫] *আত-তারীখুল কামিল, ১/৭৪ পৃ.*
[১০৬] *আত-তারীখুল কামিল, ১/৭৯ পৃ.*
[১০৭] *সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত : ৩১-৩২*

هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾

আর তার সম্প্রদায়ের নেতারা, যারা অস্বীকার করছিল এবং আখিরাতের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং যাদেরকে আমরা অঢেল সম্পদ দান করেছিলাম, তারা বলেছিল : এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ : তোমরা যা খাও সে তাই খায় এবং তোমরা যা পান করো সে তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মতো একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা আবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবে এরপরও তোমাদের উত্থিত করা হবে?

অসম্ভব! তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি, বাঁচি এখানেই।[১০৮]

আলোচ্য আয়াতগুলোতে আদ জাতী সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার না করলেও তাদেরকে অবিশ্বাসী নাস্তিক হিসেবেই গণ্য করা যায়।

কারণ পৃথিবীতে যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করে তারা কোনো না কোনোভাবে মৃত্যুর পরের জীবনকে বিশ্বাস করে। যেহেতু আদ জাতি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করেনা সেহেতু বলাই বাহুল্য যে, তারা অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিল।

এ ছাড়াও নাবী ﷺ-এর আগমনের পূর্বাপর জাহিলিয়াতের মাঝেও নাস্তিকতার উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়।

নাবী ﷺ-এর একত্ববাদের দাওয়াতের উত্তরে মক্কার মুশরিকদের বক্তব্য ছিলো এরকম :

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾

তারা বলে, একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি একমাত্র কাল ব্যতীত আমাদের কেউ ধ্বংস করে না।[১০৯]

[১০৮] *সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৩৩-৩৭*

সাঈদ ইবনু মুসাইয়ির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন :

নাবী ﷺ বলেছেন : জাহেলী যুগের লোকেরা বলতো : নিশ্চয় রাত-দিনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। সময়ের বিবর্তন ধারাই আমাদেরকে ধ্বংস করে, মৃত্যু ঘটায় ও জীবন দান করে।[১১০]

এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর জামানাতেও মক্কার পৌত্তলিকদের মাঝে নাস্তিকতার জোরালো উপস্থিতি ছিল, সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, শিরক ও মূর্তি পূজার সূচনাকাল থেকেই নাস্তিকতার সূচনা হয়েছে যা রাসূল ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কুরআনুল কারীমের দেয়া তথ্যই তার অকাট্য প্রমাণ।

সুতরাং ইউরোপিয়ানদের ১৬শ শতাব্দীতে নাস্তিকতার সূচনার দাবিটি মোটেও সঠিক নয়।

কারণ তাদের দেয়া তথ্যমতেই সক্রেটিসের পূর্ববর্তী একজন গ্রীক দার্শনিক ছিলেন, যার নাম এম্পেদোক্ল্যাস, যার জন্ম আনুমানিক ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর মৃত্যু ৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

আরো একজন গ্রীক দার্শনিক ছিলেন, যার নাম হেরাক্লিটাস, যার জন্ম ৫৩৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এবং মৃত্যু ৪৭৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।

তারা দু'জনই নাস্তিক দার্শনিক ছিলেন। সুতরাং ১৬শ শতাব্দীর পর নাস্তিকতার সূচনার দাবিটা অসত্য।

তবে হ্যাঁ পূর্ববর্তী সময়ের স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাসের মতবাদকে ১৬শ শতাব্দীতে 'মুক্তচিন্তার' ছদ্মনাম দেয়া হয়। এবং এ নামেই এ মতবাদ একটা প্লাটফর্ম দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। এর আগে নাস্তিকতার কোনো প্লাটফর্ম ছিল না।

পরবর্তীতে তা মুক্তমনা নামে পরিচিতি লাভ করে। মুক্তচিন্তা ও মুক্তমনা নামক নাস্তিক্যবাদের প্লাটফর্ম থেকেই গড়ে ওঠে কনিউনিজম মতবাদ । ***(চলবে ইনশাআল্লাহ)***

[১০৯] *সূরা জাছিয়া, আয়াত : ২৪*
[১১০] *তাবারী- ২২/৭৯, ইবনে কাসির - ৭/২৬৯ পৃ.*

সহীহ-সুন্নাহ সলাত ও নেক আমলের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে?

মুহাম্মাদ রফিকুর রহমান ★

শিরক-বিদআতমুক্ত সুন্নাতি জীবন আঁকড়ে চলাতেই সার্বিক সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা। বিপদে, মুসিবতে, দুঃখ-কষ্টে পড়লে হতাশ হয়ে আল্লাহর দোষ দেয়া, আপত্তি, অভিযোগ ও অনুযোগ করা এবং ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করা ধৈর্যের পরিপন্থি, গুনাহের কাজ। আর এতে বিপদ বরং বাড়ে কমে না। কারোর নিকট থেকে সামান্য কিছু সাহায্য সহযোগিতা পেতে হলে যেমন তার প্রশংসা, তোষামোদ, তাঁবেদারি করা লাগে তেমনি যেসব প্রাপ্তি মানুষের আয়ত্বের বাইরে তা পাওয়ার জন্য দয়ালু আল্লাহর কাছে বিনয়াবনত চিত্তে আকুল হয়ে কান্নাকাটির মাধ্যমে পরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে (সৎ নিয়তের প্রার্থনা) চাইতে পারলে তা প্রাপ্তির আশা করা যায়। সলাত আদায়ের মাধ্যমে দয়ালু আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন ও দু'আ কবুলের অন্যতম মাধ্যম। যেমনটি নাবী আইউব ﷺ দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ধৈর্য ধারণের পর ডেকে ডেকে অবশেষে মহান আল্লাহর সাড়া পেয়েছিলেন। আর আল্লাহকে ডাকার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো সলাত। সর্বোত্তম খুশু-খুজুর সাথে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঈমান সহকারে পরম অনুগত হয়ে হৃদয় উজাড় করে প্রভুর প্রতি প্রশংসা অবনত হয়ে সহীহ সুন্নাহ্ তরিকার একমাত্র সলাতেই বান্দার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া সম্ভব। অতএব, সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাত হলো- সলাত, সলাত, সলাত। সলাত আদায়ের প্রথম শর্ত হলো পবিত্র হওয়া, ওজু করা। মহান আল্লাহ নিজে পবিত্র। অপবিত্রতা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। অপবিত্র অবস্থার, নাপাক, নোংরা বা হারাম অর্থ সম্পদে গঠিত দেহ-মনের সলাত, দান-সদাকা, আমল, ইবাদাত কোনো কিছুই আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

বল 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১১১]

[১] **خبيث** (অপবিত্র) এর ভাবার্থ হচ্ছে, হারাম অথবা কাফের অথবা পাপী অথবা খারাপ। **طيب** (পবিত্র) এর ভাবার্থ হচ্ছে, হালাল অথবা মু'মিন অথবা আনুগত্যশীল অথবা ভালো জিনিস; এ সবগুলো অর্থই উদ্দীষ্ট হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, যার মধ্যে অপবিত্রতা থাকবে, তা কুফুরী হোক অথবা পাপাচার অথবা অপকর্ম, তা কোনো বস্তু হোক অথবা উক্তি; তা (সংখ্যা বা পরিমাণে) অধিক হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না, যার মধ্যে পবিত্রতা আছে। আর (খারাপ ও ভালো) এ দুই কখনও সমান হতে পারে না (যদিও খারাপ সংখ্যাগরিষ্ঠ)। কেননা অপবিত্রতা ও খারাপির কারণে সেই জিনিসের উপকারিতা ও বরকত শেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে জিনিসের মধ্যে পবিত্রতা ও কল্যাণ আছে তার উপকারিতা ও বরকত বৃদ্ধি পায়। হে আমার মহান প্রভু! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার হালাল রিযক ও পবিত্র বস্তুর কল্যাণ, উপকারিতা ও বরকত দানে অনুগৃহীত করুন।

মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। সে মুতাবেক রুহ্ সকলই আল্লাহর সৃষ্টি বিধায় মুসলিম হিসেবে পরিগণিত। নাবী ﷺ বলেছেন,

'প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) প্রকৃতির ওপর জন্ম নেয়। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়।[১১২] ইসলামের স্বভাবজাত হয়ে জন্মে ঐ প্রকৃতির ওপরে অটল থাকার নাম দীনে অবিচল থাকা। ভুলে যাওয়াটাও প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার। আর ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা ও সংকল্পের অদৃঢ়তাও সাধারণতঃ মানুষের প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এই দুই দুর্বলতাই শয়তানের কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ার কারণ হয়ে বসে। ইচ্ছাশক্তি লোপ পাওয়া ও সংকল্পচ্যুত হওয়া থেকে দয়ালু আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি হে মহান রব! আপনার ফিতরাতের ওপর আপনার বান্দাদেরকে যেমন ভূমিষ্ঠ করিয়েছেন তেমনি তাতেই অটল রাখুন।

★ হিসাবরক্ষক (অব.), বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

[১১১] সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ১০০
[১১২] সহীহ বুখারী

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অতিশয় দয়ালু বলেই কল্যাণের পথে, শান্তির পথে, নেক-কর্মের ওপর অবিচল থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। মুমিন বান্দা, তাকওয়াশীল বান্দা তাঁর সেই অমূল্য সুযোগ, রহমতকে আখেরাতের পাথেয় হিসেবে সঞ্চয় করে এবং সরল সোজা পথে অবিচল থাকে। মহান আল্লাহ অসীম করুণাময় বলেই তিনি তাঁর বান্দার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সুযোগ দিতে থাকেন সরল সোজা পথে চলে আসতে আর বারবার সাবধান করতে থাকেন। ওয়াজ নসিহাতের মাধ্যমে বিভিন্ন উপমা উদাহরণ নিদর্শন অবলোকন করিয়ে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনেও অধিকাংশ মানুষই সম্বিতপ্রাপ্ত হয় না। মুশরিক, কাফের যারা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে আল্লাহর আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সুপথের প্রতি আহ্বান করলেও তাদের হুঁশ ফেরে না। শুধুই তর্ক, অসার কথাবার্তায় অস্বীকারের পাঁয়তারা করে। সূরা কাহাফের ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ স্মরণ করে দিচ্ছেন--

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾

আমি অবশ্যই মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু মানুষ সর্বাধিক বিতর্ক-প্রিয়। মানুষের হৃদয় বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে। কৃতজ্ঞতাবোধ একেবারেই নেই। আনুগত্য প্রদর্শনে মন টলে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সমীপে আরজ জানাই- হে দয়াময় প্রভু! মানুষের কর্ণের বধিরতা চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়ে মোহর মারা হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ করে বিপথগামিতা থেকে ফিরে সঠিক হিদায়াতের পথের ওপর বহাল রাখুন।

আল্লাহর অমোঘ আদেশ- সলাত কায়েম করা। সলাত মানুষকে গোমরাহি থেকে আলোয় বের করে আনে। অন্যায় কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত রাখে। সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হয় এবং চাওয়া-পাওয়ার সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾

আর, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিঃসন্দেহে তা বড়ই কঠিন- বিনীতদের জন্যে ছাড়া।[১১৩] মুসলিমের সলাত অন্য যেকোনো ধর্মের আরাধনা, অর্চনা, উপাসনা অপেক্ষা উত্তম। জামাতবদ্ধ, সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়ে মহান আল্লাহ সমীপে অবনত মস্তকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার এ দৃশ্য অন্য কোনো ধর্মে, কোনো প্রার্থনালয়ে, কোনো দেশে, কোথাও দেখা যাবে না। আল্লাহকে ডাকার অভূতপূর্ব এ দৃশ্য অভাবনীয়। উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ে ৫০ ওয়াক্ত সলাতের সওয়াব প্রাপ্তি এক অনন্য প্রাপ্তি। মিরাজের রাতে মুসা আলাইহিস সালাম-এর পরামর্শে মেহেরবান আল্লাহর রহমাত, করুণা তাঁর প্রিয় সর্বশেষ হাবিবের সর্বশেষ উম্মতের জন্য এক অনবদ্য মোজেজা, অপরিসীম ভালোবাসা। আলহামদু লিল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর প্রিয়তম শ্রেষ্ঠ নাবী ﷺ-এর সাথে তাকে নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করেন। তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত হাদিসখানি স্মর্তব্য -

আনাস ইবনে মালিকের হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যেদিন আমার আকাশে নৈশভ্রমণ ঘটিয়াছিল, আমার প্রভু আমাকে তাঁহার এতদূর সান্নিধ্য দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ও আমার মধ্যে দুইটি পরস্পর সংলগ্ন ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানের তুল্য বা তাহা অপেক্ষাও কম, আরো কম দূরত্ব অবশিষ্ট রহিয়াছিল। আল্লাহ বলিলেন, হে আমার প্রিয়, [হে মোহাম্মদ ﷺ!] যদি আমি আপনাকে সর্বশেষ নবী করি, তাহা হইলে কি আপনার পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইবে ? আমি কহিলাম, হে আমার প্রভু, না। পুনশ্চ আল্লাহ বলিলেন, হে আমার বন্ধু, আপনার উম্মতকে সর্বশেষ উম্মতে পরিণত করিলে তাহা কি আপনার উম্মতের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইবে? আমি বলিলাম না প্রভু! আল্লাহ বলিলেন, আপনার উম্মতকে আমার সালাম জানাইয়া দিন এবং তাহাদিগকে বলুন যে, আমি তাহাদিগকে সর্বশেষ উম্মত করিয়াছি এবং আমি কদাচ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিব না। - খতীব, হায়সমী ও ইবনে জাওযী।[১১৪]

---

[১১৩] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৫*
[১১৪] *কনযুল উম্মাল ১১৫ পৃষ্ঠা) [নবুওয়তে মুহাম্মাদি-২২১ পৃষ্ঠা*

কত উচ্চ মার্গের গভীর ভালবাসা। পরম দয়ালু মহিয়ান গরিয়ান আরশের অধিপতি রাব্বুল আলামিনের ভালোবাসা তাঁর হাবীবের প্রতি, তার [রাসূল ﷺ] উম্মতের প্রতি তা কি কল্পনা করা যায়। সুবহানাল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহর ওয়াদা- তিনি সর্বশেষ উম্মতকে অর্থাৎ আমাদেরকে কদাচ লাঞ্ছিত করবেন না যদি না তাঁর অবাধ্যতা করি। সকলে আউয়াল ওয়াক্তে সঠিক তরিকায় পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের প্রতি যত্নবান হই। সকলের তরে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমাত বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর ভালোবাসা, মহব্বত পেতে হলে তাঁকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে হয় এবং স্মরণ করার, ডাকার উত্তম পদ্ধতি হলো সলাত। সুন্নতি তরিকার সলাত। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশে বলেন :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

মানুষদেরকে বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১১৫] জান্নাত প্রাপ্তির কামনা, বাসনা থাকলে, আশা করলে আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতে পারলেই সাফল্য লাভ সম্ভব হতে পারে। সূরা মরিয়ম-এর ৯৬ নং- আয়াতে আল্লাহ আরো বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে পরম দয়াময় তাদের জন্য (পারস্পরিক) সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন। সত্যিকারের মুমিনদেরকে আল্লাহ অনেক ভালোবাসেন। মহান প্রভু সমীপে আরজি জানাই- হে দয়াময়! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, আপনার অকৃত্রিম ভালোবাসার কাঙাল আমরা। আমরা যেন আপনার প্রতি সঠিক সর্বোত্তম ভালোবাসা প্রদর্শনে কার্পণ্য না করি সেই তাওফিক দান করুন। মহান আল্লাহর নিকটে অকৃত্রিমভাবে প্রাণগত হয়ে তওবা করা, তাঁর দিকে ফিরে আসাকে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে স্বাগত জানান। পাপের কারণে আন্তরিকতার সাথে তাওবা করলে তিনি বান্দার প্রতি খুশি হন, গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

সলাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য। আবার সলাত আদায়ে শৈথিল্য, অলসতা দেখানোর অর্থ হলো আল্লাহর সাথে মুনাফিকি করা, যা একেবারেই কূপমণ্ডূকতা। সূরা আন-নিসা ১৪২ নং- আয়াতে বলা হচ্ছে-

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে। (সূরা বাকারা- ২: ৯ নং- আয়াতে) বলা হয়েছে :

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, এটা তারা অনুভব করতে পারে না।

সলাত ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং অতি মহান ফরয কাজ। কপট (মুনাফিক) ব্যক্তিরা সলাতে অবহেলা ও অলসতা প্রদর্শন করার কারণে তাদের অন্তর ঈমান, আল্লাহভীতি এবং ঐকান্তিকতা থেকে ছিল বঞ্চিত ও শূন্য। আর এ কারণেই বিশেষ করে এশা ও ফজরের সলাত তাদের ওপর ভারী ছিল। যেমন, নবী করীম ﷺ বলেন,

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ.

[১১৫] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৩১*

অর্থাৎ, মুনাফিকদের ওপর এশা এবং ফজরের নামায সব থেকে বেশি ভারী।[১১৬] এই নামাযও তারা কেবল লোক প্রদর্শনের জন্য পড়ত। যাতে তারা মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিতে পারে। আল্লাহর স্মরণ নামে মাত্র করে অথবা নামায সংক্ষিপ্তাকারে পড়ে। অর্থাৎ, لاَ يُصَلُّوْنَ إِلاَّ صَلاَةً قَلِيْلَةً (নামায খুবই সংক্ষিপ্তাকারে পড়ে।) আর নামায আল্লাহর ভয় ও বিনয়-নম্রতা থেকে খালি হলে তা ধীর-স্থিরতার সাথে আদায় করা বড়ই কঠিন হয়। যেমন, [وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ] (বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন।)[১১৭] থেকেও সে কথা জানা যায়। হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন, 'এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য শয়তানের দু'টি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময়ে) পৌঁছে, তখন (তড়িঘড়ি) উঠে চারটি ঠোকর মেরে নেয়।'[১১৮] নেক আমল, সৎকাজ বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে। আল্লাহ নেক আমল, মহৎ কর্মের উত্তম বিনিময়ের ঘোষণা দিয়ে বলেন-

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে?[১১৯] মহান আল্লাহর বাণী

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।"[১২০]

কলুষিত অন্তর, কঠিন হৃদয় পরিশুদ্ধ নরম করতে পারলে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তি সহজ হয়। আল্লাহভীতি -আত্-তা'কওয়া কলুষিত অন্তরকে কলুষমুক্ত করে পরিশুদ্ধ করে দেয়। রাসূল ﷺ-এর দু'আ 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা কালবান সা-লিমা', অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পরিশুদ্ধ অন্তর কামনা করছি।[১২১] কলুষিত অন্তর ও কঠিন হৃদয় পাপে পরিপূর্ণ। আল্লাহ বলেন-

﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

'যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে ও সে পাপ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে'।[১২২] পবিত্র আত্মার প্রশান্ত আকুতি আল্লাহর রোষানল থেকে, তাঁর লানত থেকে পরিত্রাণ পেতে সহায়ক। কঠিন হৃদয়কে নরম করার উপায় বাতলেছেন প্রিয়নাবী ﷺ- এতিমের মাথায় হাত বুলাবে ও মিসকিনকে আহার্য দিবে। আল্লাহর আনুগত্যের পরপরই সকলকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা সর্বোত্তম নেক আমল। আল্লাহর জোরালো নির্দেশ :

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর (সলাত আদায়) ও কোনো কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, ১. সঙ্গী-সাথী, ২. পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের ৩. প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না।[১২৩] [৪] মহান দয়াময় আল্লাহর কাছে মিনতিঃ হে অন্তর পরিবর্তনকারী দয়ালু প্রভু! আপনার নিকটে আকুতিভরা আর্জি- আমরা যেন খুশু-খুজুর সাথে সুন্নতি তরিকায় সলাত আদায় করতে পারি এবং আমাদের অন্তরকে আপনি নিষ্কলুষ পবিত্র, পরিশুদ্ধ, অল্পে তুষ্ট নরম মমতাময় করে গড়ে তুলবার সক্ষমতা দান করুন। আমিন। সুম্মা আমিন। ❐❑

[১১৬] *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, হা : ৬৫১*
[১১৭] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৪৫*
[১১৮] *সহীহ মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, মুআত্তা, কুরআন অধ্যায়*
[১১৯] *সূরা আর-রহমান, আয়াত : ৬০*
[১২০] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৫২*
[১২১] *মুসনাদে আহমদ*
[১২২] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ৮১*
[১২৩] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩৬*

যুবকদের ঈমান রক্ষায় রাসূল ﷺ-এর উপদেশ

তাওহীদ বিন হেলাল*

রাসূল ﷺ দূরদর্শী ও অবস্থাজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ কোনো উপদেশ বা পরামর্শের জন্য এলে তিনি ঐ ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী উপদেশ প্রদান করতেন। তাই রাসূল ﷺ-এর উপদেশসমূহে মানব জীবনের প্রতিটি স্তরের উপযোগী উপদেশ পাওয়া যায়। আর মানব জীবনে যৌবনকালের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ সময়ের হিসাব আল্লাহ খুবই কঠিনভাবে নিবেন আবার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটানো যুবককে তিনি কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। এ জন্য রাসূল ﷺ-এর উপদেশমালা থেকে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে যুবকদের জন্য উপযোগী এমন পাঁচটি উপদেশ উল্লেখ করা হবে যা আমাদের যৌবনকালকে করবে সুখময় এবং আখেরাতকে করবে মধুময়, ইন শা আল্লাহ।

১. আল্লাহর কথা রক্ষা কর আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করবে (احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ):

একজন যুবকের মনে আল্লাহকে মানার তাড়না থাকলে তার দুনিয়াবী ও আখেরাতী সব সফলতার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায়। তাই রাসূল ﷺ সদ্য যৌবনে পা রাখা নব্য তরুণ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه-কে উদ্দেশ করে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুসলিম যুবকের যৌবনের প্রথম সবকে রূপ নিয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন,

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ .

ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তা'আলার (বিধি-নিষেধ) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উন্মাতও তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে সকলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।[১২৪]

উল্লিখিত হাদীসে আরবি 'গোলাম' যে শব্দটি এসেছে তা থেকে উদ্গত 'গোলামিয়্যাহ' শব্দটি তারুণ্যকে বোঝায় যা যৌবনের প্রথম দিকের সময়কে নির্দেশ করে। আর এমন আল্লাহকে সংরক্ষণকারীদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۞مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ

আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের অদূরে, কাছেই আনা হবে। এটাই, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তা প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী ও অধিক সংরক্ষণশীলদের

* অধ্যয়নরত, উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা।
বি.এ. এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া।

[১২৪] তিরমিযী, হা : ২৫১৬ সহীহ

জন্য। যে না দেখেই রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত হৃদয়ে উপস্থিত হত।[১২৫]

২. আল্লাহর ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখছ (أُعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ) :

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সংরক্ষণ করার পরই যুবককে জানতে হবে কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হয়। তাই রাসূল ﷺ এর কাছে যুবক সাহাবী মুআয رضي الله عنه উপদেশ চাইলে তিনি উপদেশ বাতলিয়ে দেন ইবাদতের ধরন এবং ওপরন্তু তাকে কথার বিপদ থেকে বাঁচার উপদেশটিও প্রদান করেন।

রাসূল ﷺ বলেন,

وعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْصِنِيْ، قَالَ أُعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِيْ الْـمَوْتٰـى وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِمَا هُوَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ قَالَ هٰذَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلٰى لِسَانِهِ.

মুআয رضي الله عنه বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উপদেশ দিন।’ তিনি বললেন, ‘এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ এবং তুমি নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। আর যদি চাও তবে তোমাকে এমন কাজের কথা বলব, যা তোমার পক্ষে এ সবের চেয়ে অধিক সহজসাধ্য।” অতঃপর তিনি নিজ হাত দ্বারা নিজের জিভের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা (সংযত রাখ)।[১২৬]

১. দুনিয়ায় বসবাস করো অপরিচিত ব্যক্তি কিংবা পথিকের ন্যায় (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ) :

আল্লাহকে মানা ও তাঁর ইবাদত পালনের পাশাপাশি একজন যুবকের জানা আবশ্যক এ দুনিয়ায় কিভাবে থাকবে। তাই রাসূল ﷺ যুবক সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنه-কে দুনিয়াতে কিভাবে থাকতে হবে তা উপদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমার দু' কাঁধ ধরে বললেন : তুমি দুনিয়াতে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী।[১২৭]

সুবহানাল্লাহ! বর্তমান বস্তুবাদী পৃথিবীতে বিশ্ব মোড়লরা যুবকদের দুনিয়াবী ক্যারিয়ারের ফাঁদে ফেলে একটি হতাশ, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ যুবশ্রেণী তৈরি করছে। অথচ বহুবছর পূর্বে রাসূল ﷺ যুবকদের দুনিয়াকে ঠিক কতটা গুরুত্ব দিলে মানসিকভাবে সুস্থ ও শান্তিতে থাকা যাবে তা শিখিয়েছেন।

৩. আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা কর (اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ) :

যৌবনকাল এবং যৌবনে পাওয়া শক্তি সামর্থ্য আল্লাহর পক্ষে থেকে পাওয়া বিশাল নেয়ামত। তাই রাসূল ﷺ যুবকদের উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত এই নেয়ামতকে প্রকৃতরূপে হিফাযত করার। রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ " . قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . قَالَ " لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ " .

ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন, আল্লাহর সাথে লজ্জা করার মতো লজ্জা করো। সাহাবীগণ বললেন, আমরা

[১২৫] *সূরা ক্বাফ, আয়াত :* ৩১, ৩২, ৩৩
[১২৬] *তারগীব, হা :* ২৮৭০, *হাসান সহীহ*
[১২৭] *সহীহ বুখারী, হা :* ৬৪১৬

আল্লাহর সাথে লজ্জা করছি, হে আল্লাহর রসূল! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: লজ্জার মতো লজ্জা এটা নয় যা তোমরা বলছ। বরং প্রকৃত লজ্জা এমন যে, যখন ব্যক্তি লজ্জার হক আদায় করে সে যেন মাথা ও মাথার সাথে যা কিছু আছে তার হিফাযাত করে। পেট ও পেটের সাথে যা কিছু আছে তারও হিফাযাত করে। তার উচিত মৃত্যু ও তার হাড়গুলো পঁচে গলে যাবার কথা স্মরণ করে। যে ব্যক্তি পরকালের কল্যাণ চায়, সে যেন দুনিয়ার চাকচিক্য ও জৌলুশ ছেড়ে দেয়। অতএব, যে ব্যক্তি এসব কাজ করল, সে ব্যক্তিই আল্লাহর সাথে লজ্জার হক আদায় করল। *(তিরমিযী, হা : ২৪৬১, হাসান হাদীস)*

৪. যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর (اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ):

যুবক যেখানেই থাকবে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবে আর যখন যৌবনের ছলনায় পড়ে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হবে তখন একটি ভাল কাজ করে নেবে; এতে পাপটি মুছে যাবে। এমনটাই রাসূল ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, 'তুমি যেখানে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে। কোনো কারণে মন্দ কাজ হয়ে গেলে তারপর পরই ভাল কাজ করবে। ভাল কাজ পাপকে মুছে ফেলবে। আর সদাচরণের মাধ্যমে মানুষের সাথে মিলে মিশে থাকবে'। *(আহমাদ, হা : ২১৩৫৪, তিরমিযী, হা : ১৯৮৭, হাসান হাদীস)*

এই পাঁচটি উপদেশকে যদি আমরা অনুধাবন করে মেনে চলতে পারি তাহলে আমাদের যৌবনকাল হবে নববী আলোয় আলোকিত আর আখেরাত হবে ইলাহী ভালবাসায় মহিমান্বিত। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড এর আওতাধীন ঐতিহ্যবাহি **''শারাবান ত্বহুরা মহিলা কওমী মাদরাসা''** কুরপালা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে একজন **'আবাসিক মহিলা সুপার'** আবশ্যক। তাই উল্লেখিত পদে আগ্রহী প্রার্থীর নিকট থেকে নিম্নের শর্ত সাপেক্ষে আবেদন করার জন্য আহবান করা হলো।

আবেদনের শর্তাবলী :

১। আবেদনকারীকে বি এ /মেশকাত পাস/ সমমান যোগ্যতা থাকতে হবে।
২। মনোনিত প্রার্থীকে আবাসিক সুবিধাসহ আলোচনা সাপেক্ষে বেতন নির্ধারণ করা হবে।
৩। আগ্রহী প্রার্থীকে কোনো আবাসিক মহিলা মাদরাসায় ২ থেকে ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪। আবেদনপত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, চারিত্রিক ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র এবং জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত করতে হবে।
৫। প্রার্থীর বয়স অনুর্ধ্ব ৫৫ বছর হতে হবে।
৬। আগ্রহী প্রার্থীকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে মোহতামিম শারাবান ত্বহুরা মহিলা কওমী মাদরাসা কুরপালা, কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

বিঃদ্রঃ আবেদনপত্র বাছাই ও নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

দরখাস্ত প্রেরণের ঠিকানা:
emx.bangladesh@gmail.com

সার্বিক যোগাযোগ :
শাইখ মোস্তফা দিলওয়ার
মোহতামিম-শারাবান ত্বহুরা মহিলা কওমী মাদরাসা
কুরপালা, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯৯৯-০৫৫৫০৪

ইসলামের সৌন্দর্য

সাইদুর রহমান*

(পূর্ব প্রকাশিত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর থেকে শেষ পর্ব)

কিছু বিদ্বান বলেছেন, আগে ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙুল, তারপর অনামিকা, তারপর মধ্যমা, তারপর শাহাদাত ও পরে বৃদ্ধাঙ্গুল। বাম হাতের আগে বৃদ্ধাঙ্গুল, তারপর শাহাদাত, তারপর মধ্যমা, তারপর অনামিকা এ পরে কনিষ্ঠা আঙুল। ডান পায়ের আগে কনিষ্ঠা আঙুল, তারপর অনামিকা, তারপর মধ্যমা, তারপর শাহাদাত ও পরে বৃদ্ধাঙ্গুল। বাম পায়ের আগে বৃদ্ধাঙ্গুল, তারপর শাহাদাত, তারপর মধ্যমা, তারপর অনামিকা এ পরে কনিষ্ঠা আঙুল কাটবে।[১২৮]

আমি ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মত গ্রহণ করেছি। এর কারণও বর্ণনা করছি। এ বিষয়ে বিদ্বানদের মতভেদ হওয়ার কারণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাতের কোন আঙুল দিয়ে শুরু করবে এ বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। এখন কথা হলো ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কথাকে কেন প্রাধান্য দেয়া হলো। আসলে তুমি যদি হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী, তুহফাতুল আহওয়াজী, নাইলুল আওতার, মিরআত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়ো তাহলে তুমি দেখতে পাবে ওই সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কথা দিয়ে টইটম্বুর। ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতহুল বারীতে একটু পরপর তার কথা নিয়ে এসেছেন। আর তিনি মুহাক্কিক বিদ্বানদের মাঝে প্রথম সারির। আর এজন্যেই তার মতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

চল্লিশ দিনের মধ্যে কিন্তু অবশ্যই কাটতে হবে। বড় হয়ে গেলে আগেই কাটবে। কোনো অবস্থাতেই যেন চল্লিশ দিন পার না হয়। রাতে-দিনে যখন ইচ্ছা কাটতে পারবে। অনেকে মনে করে রাতে নখ কাটা যাবে না। যখন অবসর হবে, সময় পাবে, তখনই কাটবে। এর জন্য ধরাবাঁধা কোনো সময় নেই। এখন কথা হলো, কোন দিন কাটবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা দুর্বল। ইমাম বাইহাকী উল্লেখ করেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমার দিন নখ ও মোছ কাটতে পছন্দ করতেন।' এই হাদীস দুর্বল। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতহুল বারীতে এই হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।[১২৯] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তিনটি উত্তর দেন। (১) জুমার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে কাটা সুন্নাহ (২) বৃহস্পতিবার দিনে কাটা সুন্নাহ ও (৩) যেদিন ইচ্ছে সেদিন কাটবে। আর এটাই গ্রহণযোগ্য কথা।[১৩০]

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'এখানে মূলনীতি হলো মানুষের প্রয়োজন। যখন তার প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন সে কাটবে।'[১৩১] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "জুমার দিন কাটা ভালো। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমার দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হয়ে মসজিদে যেতে আদেশ করেছেন।"[১৩২]

আমরা মনে করি, যে কোনো দিন কাটা যাবে, কোনো সমস্যা নেই। তবে যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমার দিন অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু সাজুগুজু করতে বলেছেন, সেহেতু জুমার দিন কাটা মুস্তাহাব । নখ, চুল, মোছ কেটে এগুলো কি ফেলে দিবে নাকি মাটিতে পুঁতে রাখবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম বাইহাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা দুর্বল।[১৩৩]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি মনে করি পুঁতে রাখা উত্তম। কারণ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন করতেন।[১৩৪]

তার থেকে আরো একটি মত পাওয়া যায়। আর সেটা হলো, কেউ যদি ফেলে দেয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)- কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে স্বাধীনতা রয়েছে। যার ইচ্ছা পুঁতে রাখবে যার ইচ্ছা ফেলে দেবে।' মুহাম্মদ বিন সালেহ উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি এ বিষয়ে স্বাধীনতা রয়েছে। যার ইচ্ছা পুঁতে রাখবে যার ইচ্ছা ফেলে দেবে। তবে পুঁতে রাখা উত্তম। কারণ কিছু সাহাবী এগুলো পুঁতে রাখতেন।'[১৩৫] আমরা মনে করি পুঁতে রাখাই উত্তম।

---

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১২৮] ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৭ হা : ৬২৯৭

[১২৯] ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৭ হা : ৬২৯৭

[১৩০] ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৭ হা : ৬২৯৭

[১৩১] ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৮ হা : ৬২৯৭

[১৩২] ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৮ হা : ৬২৯৭

[১৩৩] ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৮ হা : ৬২৯৭

[১৩৪] ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৮ হা : ৬২৯৭

[১৩৫] সূত্র, নেট

কারণ এটা মানুষের একটা অংশ। আর মানুষের অংশের একটা সম্মান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্মানীত করে সৃষ্টি করেছেন।[১৩৬] এটাই হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতহুল বারীতে বলেছেন।[১৩৭]

কিছু তরুণ-তরুণীকে দেখা যায়, দু-একটা আঙুলের নখ বড় রাখে। বিশেষ করে কনিষ্ঠা আঙুলের নখ। এটা আদৌ উচিত নয়। পতিতালয়ের মেয়ে ও অমুসলিম মেয়ে এমন করে। তুমি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কীভাবে এমন আচরণ কর। অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য রাখতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। নখ তো বড় থাকে জীবজন্তুর। তুমি তো জীবজন্তু নও। জীবজন্তু তো কাটতে পারে না। এমনিভাবে তাদের জ্ঞান নেই, নেলকাটার নেই, তারা কীভাবে কাটবে! তোমার কাছে তো সবকিছু আছে। আর তোমার বিবেক বুদ্ধিও আছে। তাহলে তুমি তো জীবজন্তুর মতো হয়ে গেলে! তোমার মাঝে ও তাদের মাঝে তফাত কোথায়! তুমি তো তাদের থেকেও নিচে নেমে গেলে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের জ্ঞান বিবেক দেননি, তাই তারা কাটে না। তোমাকে তো বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। নিরবে নিভৃতে একটু কথাগুলো চিন্তা করো। দেখো, তুমি কি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে কিনা।

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

আমরা অনেক জিন ও মানুষ জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে; কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা দেখে না, কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের থেকে বেশি বিভ্রান্ত। তারাই উদাসীন।'[১৩৮]

অপবিত্র অবস্থায়ও নখ কাটা যায়। অনেক নারী মনে করে গোসল ফরজ অবস্থায় নখ কাটা জায়েয নেই। এটা তাদের ভুল ধারণা।

এখন তোমার সাথে আমার কথা হলো গোঁফ ঠোঁটের ওপর থেকে ছাঁটবে, নাকি ঠোঁটের সাথে একেবারে ছেঁটে মিলিয়ে দেবে নাকি মুন্ডন করে ফেলবে?

অধিকাংশ হাদীসে ছাঁটার কথা এসেছে।

وَقَصُّ الشَّارِبِ 'গোঁফ ছাঁটো।'[১৩৯]

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'গোঁফ ঠোঁটের ওপর থেকে ছাঁটবে, মুণ্ডন করবে না।[১৪০]

ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট ছাঁটার চেয়ে মুন্ডন করা উত্তম।[১৪১]

কাসেম ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'গোঁফ মুন্ডন করা আমার নিকট মুছলার (অঙ্গহানি) মতো।[১৪২]

ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে গোঁফ একেবারে ঠোঁটের সাথে মিলিয়ে ছাঁটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'যে এমন করবে তাকে পেটাতে হবে।' তাকে আরো বলা হয় যে, ব্যক্তি গোঁফ মুন্ডন করে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বলেন, এমন করা বিদআত। বর্তমানে এটা মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।'[১৪৩]

অধিকাংশ সাহাবী, তাবিয়ী, ইমাম শাবী, ইবনু আব্দুল বার হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই মত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ গোঁফ ঠোঁটের ওপর থেকে ছাঁটবে, মুন্ডন করবে না।[১৪৪]

শাইখ নাসিরউদ্দিন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতাওয়া আলবানীতে এই মত পোষণ করেন।[১৪৫]

আমিও এই মত পোষণ করি।

চল্লিশ দিনের মধ্যে কিন্তু অবশ্যই গোঁফ কাটবে। কাটা কিন্তু আবশ্যক। আরে একথা আমি বলিনি। বলেছেন ইবনু হাযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।[১৪৬]

---

[১৩৬] *সূরা ইসরা, আয়াত : ৭০*
[১৩৭] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৮ হা : ৬২৯৭*
[১৩৮] *সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯*
[১৩৯] *সহীহ বুখারী, হা : ৬২৯৭*
[১৪০] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৮ হা : ৬২৯৭*
[১৪১] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৯ হা : ৬২৯৭*
[১৪২] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৯ হা : ৬২৯৭*
[১৪৩] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৩৯ হা : ৬২৯৭*
[১৪৪] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৪০ হা : ৬২৯৭*
[১৪৫] *ফাতাওয়ায়ে আলবানী, পৃ. ১৭৫*
[১৪৬] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৪১ হা : ৬২৯৭*

নাসিরউদ্দিন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতাওয়ায়ে আলবানীতে বলেছেন ওয়াজিব।[১৪৭]

আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'সলাত আদায়ের জন্য যেমন নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। অনুরূপ গোঁফ, নখ, বগলের নিচের পশম ও নাভির নিচের পশম কাটার নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে।' এখন কথা হলো- কোন দিক থেকে কাটবে। ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'ডান দিক দিয়ে গোঁফ কাটা মুস্তাহাব।'[১৪৮]

তাঁর দলীল হলো, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.

নবী (ﷺ) নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। ত্বহারাত অর্জন, মাথা আঁচড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও।[১৪৯]

বিন বায, মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন ও নাসিরউদ্দিন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'এ বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। যার ইচ্ছা ডান দিক থেকে কাটবে যার ইচ্ছা বাম দিক থেকে। কারণ এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ) থেকে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ নেই।[১৫০] আমিও এই মতের প্রবক্তা।

গোঁফ তুমি ইচ্ছে করলে নিজে কাটতে পারো অথবা কাউকে দিয়ে কাটাতে পারো কোনো সমস্যা নেই।[১৫১]

রাত-দিন যখন ইচ্ছা তখন কাটতে পারবে কোনো সমস্যা নেই। অপবিত্র অবস্থায় সিয়াম রাখা অবস্থায়ও কাটতে পারবে। আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর ইসলামী বিধান কঠিন করি। অনেক মানুষ না জেনে মনে করে অপবিত্র অবস্থায় সিয়াম রাখা অবস্থায় ও রাতে কাটা যাবে না। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কিছু যুবককে দেখা যায় ব্রিটিশ আমলের নবাবদের ভাব ধরতে। ওপর দিয়ে গোঁফ কাটে আর দুই ঠোঁটের নিচ দিয়ে কাটে না। অনেকে আবার গোঁফ প্যাচিয়ে রাখে। গোঁফ একেবারে কাটতে হবে। কিছু কাটবে আর কিছু রেখে দিবে এমন করলে হবে না। এটা কাযা (কিছু কাটা ও কিছু না কাটা) এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর নবী (ﷺ) এভাবে কাটতে নিষেধ করেছেন।

نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. নবী (ﷺ) 'কাযা (কিছু কাটা ও কিছু না কাটা) থেকে নিষেধ করেছেন।[১৫২]

কিছু শিক্ষিত মহলে দেখা যায় গোঁফ ইয়া বড় বড় করে রাখে। মুখের মধ্যে নেই দাড়ি; কিন্তু গোঁফ অনেক বড় বড়। তাদের দেখলে বড়ই আশ্চর্য হই। সম্পূর্ণ উল্টো কাজ করছে। নবী (ﷺ) বলেছেন 'দাড়ি লম্বা করতে আর গোঁফ ছোট করতে।[১৫৩]

তারা করছে এর বিপরীত। দাড়ি একেবারে মুন্ডন করে ফেলছে আর গোঁফ বড় বড় রাখছে। রাসূল (ﷺ)-এর এই বাণী যদি তাদের কাছে পৌঁছতো,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا " যে ব্যক্তি গোঁফ খাটো করে না, সে আমাদের (সুন্নাতের) অনুসারী নয়।[১৫৪]

এ সকল লোকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছেন,

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.

'তারা সরল পথ দেখলে তা গ্রহণ করবে না। আর বাঁকা পথ দেখলে তা গ্রহণ করবে। এর কারণ হলো তারা আমাদের আয়াতকে মিথ্যা মনে করে ও তারা এ ব্যাপারে উদাসীন।'[১৫৫]

দেখলে আল্লাহ তাদের সম্পর্কে কত সুন্দরভাবে বলেছেন। সবচেয়ে বিদঘুটে লাগে কিছু বৃদ্ধ মানুষকে দেখলে। মুখে দাড়ি নেই; কিন্তু গোঁফ বড় বড়। কত ভয়ংকর যে লাগে তাদের দেখলে! চোখলজ্জায় তাদের কেউ কিছু বলেও না। তারা মনে করে আমাকে কত সুন্দর দেখা যায়!! এটা তাদের বোকামি বৈকি! আল্লাহ তা'আলা তাদের সুবোধ দান করুন, আমীন। ইসলাম হচ্ছে মধ্যমপন্থি একটি জীবন বিধান। এতে যেমন বাড়াবাড়ি নেই, আবার ছাড়াছাড়ি ও নেই। কিছু লোক বাড়াবাড়ি করে বলে, গোঁফে পানি লাগলে পানি নাপাক

[১৪৭] *ফাতাওয়ায়ে আলবানী, পৃ. ১৭৬*
[১৪৮] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৪০ হা : ৬২৯৭*
[১৪৯] *সহীহ বুখারী, হা : ৪২৬*
[১৫০] *সূত্র, নেট*
[১৫১] *ফাতহুল বারী, খণ্ড, ১৩ পৃ. ৩৪০ হা : ৬২৯৭*
[১৫২] *সহীহ বুখারী, হা : ৫৯২১*
[১৫৩] *সহীহ বুখারী, হা : ৫৮৯২*
[১৫৪] *তিরমিজী, হা : ২৭৬১*
[১৫৫] *সূরা আল-আরাফ, আয়াত : ১৪৬*

হয়ে যায়'। তোমার কথার সাথে ভাই আমি একমত নই। পানি নাপাক হওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়নি। আবার কেউ বলে, 'সলাতই হবে না'। প্রিয়, সলাত হয়ে যাবে; কিন্তু সে না কাটার কারণে নবী ﷺ-এর আদেশ লঙ্ঘন করেছে। কারণ সলাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য গোঁফ কাটা শর্ত নয়। আশা করি তুমি বুঝতে পারছো।

অনেকে মাঝেমধ্যে বলে, নাকের ভেতরের পশম কাটা যাবে কিনা? আসলে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির কারিশমা বুঝা বড় দায়। তিনি আমাদের নাকের ভেতর পশম দিয়েছেন ঢালস্বরূপ, যেন ধূলোবালি ভেতরে না যায়। এই পশমগুলো ময়লা আঁটকে রাখে। এই দিকে লক্ষ্য করে না কাটাই ভালো। আর কারো যদি দু-একটি পশম বাহিরে বের হয়ে যায়, যার দরুণ বিদ্ঘুটে দেখা যায় তাহলে কেচি দিয়ে ওপর থেকে কেটে দিবে। নাকের ভেতরের পশম কাটা যাবে কিনা এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। তাই আমরা ডাক্তাররা কী বলে সেদিকে গেছি। অর্থাৎ না কাটাই ভালো। আর কারো পশম বাহিরে চলে আসলে কেচি দিয়ে কেটে দিবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাথার চুল ছাঁটার নিয়ম কী? একেবারে মুন্ডন করে ফেলবে নাকি বাবরি রাখবে, নাকি ছোট করে কাটবে? চুল কাটার ক্ষেত্রে দুটি মূলনীতির কথা মনে রাখতে হবে। (১) কাটের ধরনটা যেন কাফেরদের মতো না হয়।

" مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " যে কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করলে ধরা হবে সে তাদের দলভুক্ত।[১৫৬]

لا تَشبَّهوا باليهودِ والنَّصارى 'তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে না।'[১৫৭]

(২) কিছু চুল রাখা ও কিছু কাটা যাবে না। হাদীসের পরিভাষায় একে কাযা বলা হয়। আর এরূপ করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন।

نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. নবী ﷺ 'কাযা (কিছু কাটা ও কিছু না কাটা) থেকে নিষেধ করেছেন।'[১৫৮]

رأى النَّبيُّ - ﷺ - صَبيًّا قد حلقَ بعضَ شعرِهِ وترَكَ بعضَهُ فنَهاهم عن ذلِكَ وقالَ: احلِقوا كُلَّهُ أو اترُكوا كُلَّهُ.

নবী ﷺ এক বালককে দেখতে পেলেন তার মাথার কিছু চুল মুন্ডন করা হয়েছে আর কিছু রেখে দেয়া হয়েছে। তারপর তিনি এমন করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ চুল মুন্ডন করো অথবা সম্পূর্ণ রেখে দাও।[১৫৯]

তারপর কথা হচ্ছে, নবী ﷺ বাবরি রেখেছেন এটা মনে করে কেউ যদি বাবরি রাখে তাহলে আশা করা যায় সে সাওয়াব পাবে। কারণ বাবরি রাখাটা হলো সুন্নাতে আদাদী তথা অভ্যাসগত সুন্নাহ। বাবরি রাখা দাড়ি রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ না। কারণ দাড়ি রাখার জন্য নবী ﷺ যেমন গুরুত্বারোপ করেছেন, বাবরি রাখার জন্য ততটা করেননি। আমাদের একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ দু'ধরনের। সুন্নাতে আমালী তথা আমলগত সুন্নাহ ও সুন্নাতে আদাদী তথা অভ্যাসগত সুন্নাহ। আমাদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে সুন্নাতে আমালী গ্রহণ করা আদাদী আবশ্যক নয়। কেউ যদি আদাদী সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করে তাহলে আশা করা যায় সে সাওয়াব পাবে। কারণ সে নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণের চেষ্টা করেছে। আর কেউ যদি না করে তাহলে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। আমার জানা মতে কোনো হাদীসে নবী ﷺ বাবরি রাখার জন্য আদেশ করেননি, যেমন আদেশ করেছেন দাড়ি রাখার জন্য। আরো কিছু সুন্নাতে আদাদীর নাম উল্লেখ করছি। যেমন : পাগড়ি পরা, লাঠি নিজের সাথে রাখা প্রভৃতি। মক্কার কাফেররাও পাগড়ি পরতো ও বাবরি রাখতো। আশা করি তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছো। অনেক মানুষ মাথা মুন্ডন করাকে আল্লাহ ওয়ালার লক্ষণ মনে করে। এটা আদৌ উচিত নয়। এটা হলো সুফিদের ধারণা। মাথা মুন্ডন করা জায়েয আছে, কোনো সমস্যা নেই। তবে মাথা মুন্ডন করাকে সাওয়াবের কাজ বা বুযুর্গ, আল্লাহ ওয়ালার লক্ষণ মনে করা যাবে না। মাদরাসায় পড়ার সূচনাকালে কিছু উস্তাদ আমাদের মাথা মুন্ডন করার কথা বলতেন। আমরা দেখতাম যে, ছাত্ররা মাথা মুন্ডন করতো তাদের আল্লাহ ওয়ালা ছাত্র মনে করা হতো, তাদের প্রতি আলাদা দৃষ্টি দেয়া হতো। এসব কিছু সুফিদের থেকে আসা খেয়াল মাত্র। আল্লাহ সুবোধ দান করুন, আমীন।❐❑

[১৫৬] *আবু দাউদ, হা : ৪০৩১*
[১৫৭] *সহীহুল জামে, হা : ১০৬৭*
[১৫৮] *সহীহ বুখারী, হা : ৫৯২১*
[১৫৯] *সিলসিলাতুস সাহীহা, হা : ১১২৩*

শুব্বানে পাতা | صفحةالشبان

সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার; সাম্রাজ্যবাদীদের নীলনকশা

মাযহারুল ইসলাম [❄]

প্রারম্ভিকা :

১. ইসলাম পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন মানবিক ধর্ম। মানবিক, সামাজিক, পারিবারিক ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সুষম নীতিমালা নির্ধারিত রয়েছে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মে। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতার বিষয়টি সব মত পথ ও দল থেকে ভিন্ন এবং সুস্পষ্ট। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে, এযাবৎ পৃথিবীতে যত সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে সেটার মৌলিক কারণ হলো- নৈতিকতাবোধ। যে জাতি যত বেশি মানবিক চাহিদা তথা যৌণতার ব্যাপারে যত বেশি সংযমী সে জাতি তত বেশি সমৃদ্ধশালী ও অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে সাথে সভ্যতার শোচনীয় দূরবস্থা, অধঃপতনের এই একটিই কারণ ছিল তা হলো- অবাধ যৌনাচার, অনিয়ন্ত্রিত বিকৃত যৌনাচার ও মানবিক মূল্যবোধ। বিশ্বব্যাপী ইসলামের শত্রু খোদ ইহুদি খ্রিস্টান মহল পৃথিবীতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বহুকাল থেকেই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরি করে চলছে। তাদের সেই নীল নকশার মধ্যে অন্যতম একটি হলো - ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা। যত দিন যাচ্ছে ততই তাদের কার্যক্রম, কাজের কৌশল, পরিধি বৃদ্ধি করছে। গোটা বিশ্বজুড়ে তাদের এই নগ্ন ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতাকে মানবমনে খুবই স্বাভাবিকিরণ ও মানুষকে এর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তার বাস্তব প্রয়োগও ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ এই ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা নিঃসন্দেহে ইসলামী শরিয়তে হারাম এবং মানুষের স্বভাবজাত মানবিক মূল্যবোধ, আল্লাহর দেয়া ফিতরাতের বিরোধী জঘন্য পাপ এমনকি এটা পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড। নিঃসন্দেহে এটাকে সাপোর্ট করা, বৈধতা প্রদান করা অর্থই হলো- নৈতিক মূল্যবোধ, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সর্বোপরি আল্লাহর ফিতরাতবিরোধী কার্যক্রম দ্বারা আল্লাহকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো যা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামান্তর। খোদ ইহুদি খ্রিস্টান মহল তো এটাই চায়। তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুসলিম বিশ্বকে করায়ত্ত করতে চায়। তারা তাদের মতাদর্শ ছাড়াও বিভিন্ন কিছু চাপিয়ে দিতে চায়। মুসলিমদের আদর্শিকভাবে পরাজয় চায়। সেটা মুসলিমরা ইচ্ছায় মানুক কিংবা অনিচ্ছায়। এই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে তারা পৃথিবীর ওপর অনেক আগ থেকেই বিজয়ের পথে পাড়ি দেয়ার জন্য নানা ধরনের নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করে চলছে। বিজ্ঞান বলছে, ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতার কোনো ভিত্তি নেই, এটি জন্মগত না বরং এটি হচ্ছে স্বেচ্ছায় বেছে নেয়া একটি বিকৃতি। এই বিকৃতিটাই তারা ছড়িয়ে দিতে চায় গোটা বিশ্বে। বিভিন্ন এনজিও, সংস্থা আর সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। রিপোর্ট বলছে, পৃথিবীর ১৯৫টিও বেশি দেশ সমকামিতাকে বৈধতার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এমনকি সমকামী বিয়ে বৈধতা দেয়া হয়েছে ২৭টির বেশি দেশে। মূলতঃ এই লজ্জাজনক ন্যাক্কার কাজটা একদিনে হয়নি বরং এই কাজে সফল হতে তাদের কয়েক দশক সময় লেগেছে। কিন্তু তারা তাদের মিশন চালাতে পিছপা হননি। বরং এই কাজে অর্থ, সময়, বুদ্ধি, শ্রম চলমান রেখেছিল। সেই সাথে তারা বিভিন্ন এনজিও, সমাজসেবা, সংস্থা, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় তাদের এই মত, পথ সর্বমহলে শিথিল, সংবেদনশীল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বৈশ্বিক এজেন্ডা হিসেবে তাদের বিভিন্ন এনজিও, সমাজসেবা সংস্থা, দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অনেক প্লাটফর্ম কাজ করে চলছে। তন্মধ্যে OHCHR, UNDP,

❄ *খানসামা, দিনাজপুর*

UNICEF, UNODC, UNESCO, UNAIDS, WFP ছাড়াও আরো অনেক বিশ্ব সংস্থা বিদ্যমান। সমকামিতাকে স্বাভাবিক বিষয় বলে উপস্থাপন করার জন্য খোদ হলিউড সিনেমাতে ২০১৮ সালে রিলিজপ্রাপ্ত প্রায় ১২.৮% LGBT (Lesbian, Gay, Bi sexual, queer) চরিত্রে উপস্থাপন করে। বিশেষ করে এই সিনেমাগুলো তে প্রায় ১৫ বছরের বয়সীদের সমকামী বা বিকৃতকামী চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়। এটা তাদের আরেকটি টোপ। যেই টোপ গোটা বিশ্ব সহজেই গিলবে বলে তারা এমনটি করেছে। কারণ হলো পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন হলিউড মুভি, সিরিজের নীরব দর্শক। ফলে এগুলো মুভি, সিনেমাতে উপস্থাপন করার মাধ্যমে এক সময় এটা তাদের স্বভাবজাতভাবেই স্বাভাবিক বলে মনে করতে বাধ্য হবে। এমনকি কোনো এক সময় এর পক্ষে সাফাই গাইবে। এমনিভাবে তারা বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতিকেও করায়ত্ত করেছে। বিশ্বের বড় বড় ধনী গ্রুপ, কোম্পানি, কর্পোরেশন থেকে অনুদান গ্রহণ করে। অ্যাপল, মাইক্রোসফট কিংবা আমাজন বলেন সবার কাছ থেকে পাওয়া অনুদান গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার ছাড়াও যত ধরনের বিকৃত মানসিকতা, মূল্যবোধ আছে সেই খাতে তারা তাদের অর্থ যোগান দিয়ে চলছে। ফলে বিশ্বব্যাপী তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার শিশু-কিশোরও। তারা বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, হাইস্কুল, প্রাইমারি ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে পড়ালেখার নামে 'যৌনাচার 'সমকামিতা' শিক্ষা দিচ্ছে। এজন্য তারা একটি ঐক্য পরিষদ তৈরি করে নাম দিয়েছে - Gay Straight Alliance Club 'স্বাভাবিক শিশু ও সমকামী শিশু'। তাদের কাজই হলো প্রতিটি স্কুলের শিশুদের শিশু মনে সমকামিতার প্রসার এবং স্বাভাবিকীরণ করা। গোটা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে যৌনাচারের নোংরামি শিক্ষা দিয়ে সমাজ, জীবনকে অধঃপতিত ও একটি অসভ্য সমাজ গঠনের জন্য তারা এমন প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা এমন কারিকুলাম প্রণয়ন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। সেই কারিকুলাম থেকে আমাদের বাংলাদেশও কিন্তু পিছিয়ে নেই!

সমকামিতাকে স্বাভাবিকীরণ ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা কথিত সেলিব্রিটিদের দ্বারা নানা ধরনের সিনেমা, নাটক, ওয়েব সিরিজ ছাড়াও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্ববিখ্যাত সব তারকাদের নিয়ে তারা বড় বড় বাজেটের আয়োজন করে। উপস্থাপন করে বিকৃত যৌনাচারের স্থিরচিত্র এবং এই সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার নামক বিকৃত মানসিকতাকে একটি স্টাইল, মডেল হিসেবে উপস্থাপন করছে এবং সেই সাথে তাদেরকে ইয়াং জেনারেশনের কাছে ভালোই গ্লামারাস করে তুলছে। বিভিন্ন ম্যাগাজিন, বিনোদনমূলক সংবাদমাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতার মতো পথকে লালন, বিশ্বাস করা তারকাকে বিশ্বে বড় স্টাইলিস, সেলিব্রিটি বানানোর জন্য প্রশংসায় পঞ্চমুখ করে। এজন্যই তো বিটিএস-এর মতো বিকৃত যৌনাচার মানসিক ভারসাম্যহীন দলের সাফাই গাইতে দেখা যায় ইয়াং জেনারেশন ভাই-বোনদের। এমনকি আশ্চর্যের বিষয় হলো - অনেক তরুণ-তরুণী বিটিএস-এর আর্মি বলেও দাবি করে। তাদেরকে অন্ধের মতো ভালোবাসে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য করলেই তাদের গায়ে আগুন জ্বলে ওঠে। বিশ্বজুড়ে এমন নোংরামি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শুধু বিটিএস এর মতো সংগঠন নয় বরং আরো অনেক সংগঠন আছে। এমনকি এমন যৌনাচার, নোংরামিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা বিনামূল্যে কনডম, লুব্রিকেন্ট বিতরণ করতেও পিছে নেই। সেই সাথে যৌণতাকে নরমালাইজ করার জন্য শিশুদের অবাধ মিশ্রণ করার জন্য বৈশ্বিক পরিকল্পনা করছে। যা বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিষয়টি সহজেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশও এক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে। বিশেষ করে বামপন্থী, মোটা মাথার বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত সুশীল সমাজ বেশি তোড়জোড় করছে। সময়ে সময়ে এরা নড়েচড়ে বসে, কথা বলে, পরিকল্পনা করে। বিশ্ব মোড়লদের এবং জাতিসংঘের বাণীকে এরা জানে প্রাণে মানে। জাতিসংঘ ও বিশ্ব মোড়ল বলেছে- সমকামী বিয়ে বৈধ। এজন্য জাতিসংঘ এর প্রতি জনগণের সহনশীলতা পোষণের জন্য পদক্ষেপ নেয় Free and Equal ক্যাম্পেইন।

এভাবেই এই বিকৃত, অসভ্য যৌনাচারকে সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

২. ট্রান্সজেন্ডার হলো সমকালীন বিশ্বের একটি বিষাক্ত ভাইরাস ট্রেনডার। এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে খোদ আমেরিকা, ইউরোপ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে দেশে চলছে নানা ধরনের আয়োজন, কার্যক্রম এবং প্রদর্শনী। মূলতঃ ট্রান্সজেন্ডার বলতে সহজ ভাষায় বোঝায় - লিঙ্গ পরিবর্তন তথা কেউ যদি জন্মগতভাবে পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সময় ও যুগের চাহিদায় সে নিজেকে যদি মনে করে সে পুরুষ না বরং সে নারী। তাহলে সে পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে যেই আইডেন্টিটি পছন্দ করবে সেটাই সে ধারণ করতে পারবে। এখানে মনে রাখবেন যে, এই পরিচয়কে আবার হিজড়া পরিচয়ের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না। সাদৃশ্য হিজড়ার সাথে থাকলেও আদৌও এরা হিজড়া পরিচয় কিংবা এটাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর পক্ষে দাবি তোলা অধিকার আদায়ের পক্ষ জোরদার করে না। বরং এরা জেন্ডার বৈষম্যকে কেন্দ্র করে একটি বিকৃত, অরুচি এবং অশ্লীলতা ছড়ানোর জন্য এমন নোংরা ষড়যন্ত্রের নীলনকশা তৈরি করে। যদিও সবাই হিজড়া পরিচয়, সংজ্ঞা জানে। এজন্য তারা হিজড়া সংজ্ঞা কিংবা পরিচয়ের দিকে ঝুঁকে না বরং এর সাথে মিল রেখে মাঝখান থেকে ট্রান্সজেন্ডারকে উদ্ভব করে। যদিও হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিধান ভিন্ন। ট্রান্সজেন্ডারকে যদিও প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও একে ধারণ করে পরিচয় দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সাম্রাজ্যবাদী মহল এবং তারা এটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ট্রান্সজেন্ডার বিজ্ঞান সম্মত ও এটা সহজ, স্বাভাবিক, জন্মগত বলে প্রচারণা করছে। অথচ সারা দুনিয়ার বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্রে এমন ভুঁইফোড়, নোংরা চিন্তা, মতবাদকে বহু আগেই আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। বিজ্ঞান বলেন কিংবা চিকিৎসা বিজ্ঞান সবাই বিনা বাক্যে এটাকে নাকচ করেছে, করছে। কেননা এটা পরিচয়বিরোধী, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি ধর্মবিরোধী। এমন শ্রেণিবিন্যাসে মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষ আশরাফুল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেননি যে মানুষ যে পুরুষ হয়ে জন্ম তাকে নারী পরিচয় দিতে হবে কিংবা নারী হয়ে জন্ম তাকে পুরুষ পরিচয় দিতে হবে! নিঃসন্দেহে এটা একটি হীন, নোংরা ষড়যন্ত্রের নীলনকশা। কেননা যদি এমন পরিচয় দেয়া হয় তাহলে সমাজে অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা পড়বে। সময়ে সময়ে ব্যক্তির পরিচয়ের পরিবর্তন করে নিজের চরিতার্থ হাছিল করবে। 'সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ' কায়েম হবে। নিজের স্বভাব 'সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্রবিরোধী ট্রান্সজেন্ডার এমন চিন্তার ফসল নিয়েই যে আমদানি তা কিন্তু নয় বরং আরো অনেক কিছু চিন্তা-চেতনা সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায়। যার মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হলো ইসলাম ও মুসলিম। কেননা ইসলামে এরকম নোংরামি, অশ্লীলতার কোনো সুযোগ নেই। বরঞ্চ এ ধরনের যত প্রকার আছে সেসবের বিরুদ্ধে অবস্থান সুস্পষ্ট করেছে ফলে এমন কোনো জানালা নেই যেটার দ্বারা এমন মতবাদ কিংবা সংবেদনশীল উঁকি দিবে আর সেটাই স্বাভাবিকীকরণ কিংবা সহজ সমীকরণে এসে দাঁড়াবে, এমনটি ভাবার নিতান্তই নিস্প্রয়োজন। কেননা ট্রান্সজেন্ডার, সমকামিতা কিংবা পশুকামিতা যাই হোক না কেন সর্বধরনের হীন কাজ ইসলামী শরিয়তে হারাম এবং মারাত্মক গর্হিত কাজ। ট্রান্সজেন্ডার মনোভাবকামী ও এই চিন্তা, মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দের মাঝে কোনো রকম পার্থক্য ছাড়াই বুঝাতে চাচ্ছে যে, মূলতঃ ট্রান্সজেন্ডার হলো হিজড়া। সহজ ভাষায় তৃতীয় লিঙ্গ বলতে ট্রান্সজেন্ডার। সত্যি কথা বলতে এরা হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় শব্দের পার্থক্য না করে হিজড়া শব্দকে নিজের চরিতার্থ হাছিল করার জন্য ব্যবহার করতে উদগ্রীব। প্রকৃতপক্ষে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার-এর মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। একটি হলো জেনেটিক সমস্যা আর একটি স্বঘোষিত আইডেন্টিফাই। সহজ ভাষায় বলি- হিজড়া হলো একটি জন্মগত জেনেটিক সমস্যা (জন্মগত সমস্যা) যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিতরাতগতভাবে হয়ে থাকে। আর ট্রান্সজেন্ডার হলো- স্বঘোষিত নারী কিংবা পুরুষ বলে পরিচয় করিয়ে দেয়ার আইডেন্টিফাই। যা বৃহৎ পরিসরে স্বার্থ হাছিল করার জন্য ব্যবহার করতে চায় এবং পৃথিবীব্যাপী অশ্লীলতা, অন্যায়, সংঘাত ছড়িয়ে দিতে চায়। তারা

পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে এই ঘৃণিত কাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঁয়তারা চালায়। যেমন পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার ২০১৮ সালে সংসদে আইন পাশ করা হলে পরবর্তীতে ২০২৩ সালের ১৭ মে আইনটি বাতিল করতে বাধ্য হয়। কারণ হলো- এই মতবাদ যদি এভাবে চালু থাকে তাহলে তাদের পারিবারিক, সমাজব্যবস্থা টিকে থাকা হুমকির মুখে পড়বে। কেননা ট্রান্সজেন্ডার হলো জন্মগত পরিচয়ের সাথে মনস্তাত্ত্বিক জেন্ডার আইডেন্টিফাইয়ের অনুভূতির মারাত্মক সংঘর্ষ। যা চলমান থাকলে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে। ট্রান্সজেন্ডার মানুষের পরিচয়গত বিষয়টিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। একজন মানুষ সে পুরুষ না নারী বলে পরিচয় দিবে এতেই সে হীনমন্যতা, সংকীর্ণতা এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে। প্রশ্ন হলো আপাতত ধরেই নিলাম যে, সে কোনো একটি পরিচয় ধারণ করলো। তাহলে পরবর্তী ধাপে তার হুকুম কী হবে? ধরুন একজন পুরুষ সে ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় গ্রহণ করে এখন সে নারী বলে পরিচয় দিচ্ছে! এক্ষেত্রে ইসলামী শরিয়তে তার বিধান কী হবে? তার ইবাদত, উত্তরাধিকার, বিভিন্ন বিধান কীভাবে বর্তাবে? মূলতঃ এরা ইসলামী শরিয়তের সাথে তামাশা করার নামান্তর। দেখবেন এরা যেদিকে বৃষ্টি ঠিক সেদিকে ছাতা নিয়ে অবস্থান করতে চায়। 'সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ' নীতি অবলম্বন করে। এমনিভাবে অনেক সমস্যা, জটিলতা ও প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে যার উত্তর তাদের কাছে নেই। এটা তো শরীয়তের দৃষ্টিতে বললাম। বাস্তবতার নিরিখে যদি বলা হয়, বাংলাদেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা অফিস আদালত যেটা শুধুমাত্র নারী কিংবা পুরুষ অধুষ্যিত সেখানে কি এমন কাউকে, যে নিজেকে নারী কিংবা পুরুষ বলে পরিচয় দেয় বা ট্রান্সজেন্ডার এর ভাষায় নিজেকে আলাদা কিছু দাবী করে, তাকে চাকরি কিংবা পড়ালেখার সুযোগ দেবে? নিঃসন্দেহে এটা মানতে চাইবে না। এমনভাবে বাসে, গাড়িতে, বিমানে ছাড়াও যেখানে সেখানে নির্ধারিত নারী আসন কিংবা পুরুষ আসন, জায়গায় নিজের সুবিধা অর্জনের জন্য যে কেউ এমনটি করতে পারে যে আপাতত আমি নারী, পুরুষ! এভাবে স্বঘোষিত আইডেন্টিফাই সমাজ ভাঙনের এবং পরিবেশের স্থতিশীলতা মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলবে এবং দিনে দিনে জটিলতা সৃষ্টি হবে। জটিলতার সমীকরণে সমাজের অশ্লীলতা, জেনা, ব্যাভিচার প্রকাশ্যে ছড়ানোর একটি বিভৎস রূপই হলো- ট্রান্সজেন্ডার। একজন পুরুষ বাহ্যিকভাবে কিন্তু মননজগতে সে নিজেকে নারী বলে দাবি করে! কিংবা একজন নারী বাহ্যিকভাবে মননজগতে সে নিজেকে পুরুষ দাবি করে! তাহলে শারীরিক সম্পর্ক (বৈবাহিক জীবন) কার সাথে করবে? আদৌ সে কি পুরুষ কিংবা নারীর সাথে করবে? যদি সেই পুরুষ নিজেকে মনন জগতে নারী দাবি করে আর নারী নিজেকে পুরুষ দাবি করে, তাহলে তো প্রকারান্তরে সমকামিতাই হচ্ছে। এমন নোংরামি চিন্তা পাশ্চাত্য সভ্যতা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে গোটা দুনিয়ায়। সম্প্রতি আমাদের বাংলাদেশও এমন ষড়যন্ত্রের শিকার। বেশ কয়েক বছর থেকে এই মতবাদকে নরমালাইজ করার জন্য অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে। এটাকে নিলর্জভাবে বৈধতার সাফাই কিংবা সহজ, স্বাভাবিকীকরণ করার জন্য মিডিয়া জোরালো ভূমিকা রাখতে মরিয়া। অনেক নাট্যকার, লেখক, বুদ্ধিজীবীও লজ্জা শরম বেঁচে খেয়েছে! নইলে এমন কুরুচিপূর্ণ মতবাদকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার জন্য এত গলাবাজি, সভা, সেমিনার, বিবৃতি দেয় কেন? মনে রাখবেন, এটা শুধু একটি মতবাদ নয় বরং এটা একটি আমাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নাম। অত এব এমন কুরুচিপূর্ণ মতবাদকে সমাজ জীবন থেকে মাইনাস করতে হবে এবং আল্লাহর বিধান চির সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে বা যারা এমন অসভ্যতাকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায় তাদের গোমর ফাঁস করতে হবে যা ইতোমধ্যে সবাই জেনেছে। সেইসাথে জনসাধারণকে বুঝাতে হবে এদের বিভৎস ষড়যন্ত্র। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান, আমল বিনষ্টকারী সকল মতবাদ, মিশন, ভিশন থেকে আমাদের নীতি, নৈতিকতাকে পবিত্র করার তাওফীক দান করুক, আমীন এবং আমাদের ইলমী যোগ্যতা দান করুক যেন ইসলাম ও কুফরের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য সূচিত করে নব্য জাহিলিয়াতের গায়ে আঁচড় মেরে বাতিলকে চূর্ণ করতে পারি। আমিন। ❐❑

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) *দ্বীনের ভিতরে মধ্যমপন্থা বলতে কী বুঝায়?*

মশিউর রহমান, পলাশ, নরসিংদী

উত্তর দ্বীনের ভিতরে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের অর্থ এই যে, মানুষ দ্বীনের মধ্যে কোনো কিছু বাড়াবে না। যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এমনিভাবে দ্বীনের কোনো অংশ কমাবে না। যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত দ্বীনের কিছু অংশ বিলুপ্ত করে দেয়।

নবী ﷺ-এর জীবনীর অনুসরণ করাও দ্বীনের মধ্যে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জীবনাদর্শ অতিক্রম করা দ্বীনের ভিতরে অতিরঞ্জনের শামিল। তাঁর জীবন চরিতের অনুসরণ না করা তাঁকে অবহেলা করার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একজন লোক বলল আমি আজীবন রাত্রী বেলা তাহাজ্জুদের নামায পড়ব। রাত্রীতে কখনই নিদ্রা যাব না। কারণ নামায সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদাত। তাই আমি নামাযের মাধ্যমে বাকী জীবনের রাতগুলো জাগরণ করতে চাই। আমরা তার উত্তরে বলব যে, এই ব্যক্তি দ্বীনের মাঝে অতিরঞ্জিতকারী। সে হকের ওপর নয়। নবী ﷺ-এর যুগে এরকম হয়েছিল। তিন জন লোক একত্রিত হয়ে একজন বলল, আমি সারা রাত নামায আদায় করব। আর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা রাখব এবং কখনো তা ছাড়ব না। তৃতীয় জন বলল, আমি স্ত্রী সহবাস করব না। নবী ﷺ এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, একদল লোকের কী হল তারা এ রকম কথা বলে থাকে? অথচ আমি রোযা রাখি এবং কখনো রোযা থেকে বিরত থাকি। রাতে ঘুমাই এবং আল্লাহর এবাদত করি। স্ত্রীদের সাথেও মিলিত হই। এটি আমার সুন্নাত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে রাসূল ﷺ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা করলেন। কেননা তারা রোযা রাখা না রাখা, রাত জাগরণ করা, ঘুমানো এবং স্ত্রী সহবাস করার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল। দ্বীনী বিষয়ে যে ব্যক্তি অবহেলা করে বলবে যে, আমার নফল ইবাদতের দরকার নেই। শুধু ফরজ ইবাদতগুলো পালন করব। আসলে সে ব্যক্তি ফরজ আমলেও অবহেলা করে থাকে। সঠিক পথের অনুসারী হল সেই ব্যক্তি যে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহর ওপর চলবে। অন্য একটি দৃষ্টান্ত হল, মনে করুন তিনজন ভাল লোকের পাশে রয়েছে একজন ফাসেক ব্যক্তি। তিনজনের একজন বলল, আমি এই ফাসেককে সালাম দিব না। তার থেকে দূরে থাকব এবং তার সাথে কথা বলব না। অপরজন বলল, আমি এর সাথে চলব, তাকে সালাম দিব, হাসি মুখে তার সাথে কথা বলব, তাকে দাওয়াত দিব এবং তার দাওয়াতে আমিও শরীক হব। আমার নিকট সে অন্যান্য সৎ লোকের মতই। তৃতীয়জন বলল, আমি এই ফাসেক ব্যক্তিকে তার পাপাচারিতার কারণে ঘৃণা করি। তার ভিতরে ঈমান থাকার কারণে আমি তাকে ভালোবাসি। তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করব না। তবে তাকে সংশোধনের কারণে বর্জন করা হলে তা ভিন্ন কথা। তাকে বর্জন করলে যদি তার পাপাচারিতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে আমি তাকে বর্জন করব না। এই তিনজনের প্রথম ব্যক্তি বেশি বাড়াবাড়ি করল। দ্বিতীয়জন ত্রুটি করল এবং তৃতীয়জন মধ্যমপন্থা ও সঠিক পথের অনুসরণ করল।

প্রশ্ন (২) *অশুভ দৃষ্টির মাধ্যমে কি ভাগ্যের পরিবর্তন হয়? আর একটা হাদীস পড়লাম, রাসূল ﷺ বলেছেন অশুভ দৃষ্টির প্রভাব সত্য, যদি কোনো কিছু ভাগ্যের লিখনকে অতিক্রম করত, তাহলে অশুভ দৃষ্টিই তা করতে পারত।[১] এটার ব্যাখ্যা কী? এটা কি ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে নাকি আমার ভাগ্যে এটাও লিখা আছে যে অশুভ দৃষ্টির মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন হবে?*

মাসুম রানা, বিনোদপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উত্তর আপনি যে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেটি সহীহ মুসলিমের হাদীস।[২] হাদীসে এমন কিছু নেই, যা প্রমাণ করে যে, অশুভ দৃষ্টি ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

[১] *সহীহ মুসলিম, ইবনে মাজাহ*
[২] *তিরমিযী হা : ২৯৫৯*

অশুভ দৃষ্টি কারো ওপর পড়লে সেটাও আগে থেকেই ভাগ্যে লিখা আছে। যত বালা-মুসীবত আছে, তা সবই আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। হাদীসটিতে বদ নযর বা কুদৃষ্টির প্রভাবকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মানুষের ওপর এর প্রভাব পড়ে। তার মানে এটা নয় যে, অশুভ দৃষ্টি তাকদীরকে ডিঙিয়ে যেতে পারে। ইমাম কুরতুবী বলেন, হাদীসে বলা হয়েছে যে, কুদৃষ্টির প্রভাব আছে। ইমাম ইবনে আবীল বার্ বলেন, যদি কোনো কিছু ভাগ্যের লিখনকে অতিক্রম করত, তাহলে অশুভ দৃষ্টিই তা করতে পারত, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, সে তাই পায়। আরো প্রমাণিত হয় যে, অশুভ দৃষ্টি তাকদীর অতিক্রম করতে পারে না। তবে অশুভ দৃষ্টিটাও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।

☞ প্রশ্ন (৩) *স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিয়ে দেয় তখন তাদের একটা বাচ্চা ছিল। এই বাচ্চাটাকে কোর্ট স্বামীর নিকট দিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তালাকপ্রাপ্ত মহিলা কি তার বাচ্চার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে?*

মাসুম রানা, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

উত্তর তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সন্তান যদি তার স্বামীর সাথে থাকে, তাহলে মহিলা সেখানে গিয়ে তার সন্তানদের সাথে দেখা করতে পারবে। সন্তানরাও তার কাছে এসে দেখা করে যেতে পারবে। এতে ইসলামী শরীয়তে কোনো বাধা নেই।

☞ প্রশ্ন (৪) *যে ইমাম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান তার পেছনে কি নামাজ হবে? যদি না হয় তাহলে কী করণীয় ইনশাআল্লাহ জানাবেন। জাযাকাল্লাহু খাইরান।*

আব্দুর রাকিব, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

উত্তর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হলেন সেই আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপরে সমুন্নত হলেন।"[৩] কুরআনুল কারীমে এরকম আরো কয়েকটি আয়াত এবং একাধিক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের ওপর আরশে সমুন্নত। আল্লাহকে ওপরে বিশ্বাস করা ফরয। অন্যথায় কারো ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। তাই যে ইমাম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান, তাকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেয়া বৈধ নয়। কোনো ইমাম সম্পর্কে যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, সে আল্লাহকে সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বাস করে, তাহলে তার পেছনে নামাজ আদায় বৈধ নয়। কেননা সে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত আকীদাহ পোষণকারী হিসেবে কাফের গণ্য হবে। কোথাও যদি এমন আকীদাহর ইমাম নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে মসজিদ কমিটির ওপর আবশ্যক হচ্ছে তাকে বিতাড়িত করে তার স্থলে একজন বিশুদ্ধ আকীদাহর ইমাম নিযুক্ত করা।

☞ প্রশ্ন (৫) *ফিলিস্তিনের হামাস নামক সশস্ত্র যে সংগঠনটি ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন হওয়া আবশ্যক।*

আসাদুল্লাহ, ডেমরা, ঢাকা

উত্তর আমাদের জানা মতে, ফিলিস্তিনের আকীদাহ-মানহাজ সম্পর্কে মুসলিম উম্মার বিজ্ঞ আলেমদের একাধিক ফতোয়া রয়েছে। ইমাম আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), আল্লামা বিন বায রাহিমাহুল্লাহ, মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহ এবং আরো অনেক সালাফী আলেম ফিলিস্তিনের সংগঠনগুলো বিশেষ করে হামাস, ইখওয়ানুল মুসলিম এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাঠকদেরকে সেগুলো পাঠ করার আহব্বান জানাচ্ছি। আশা করি তাদের জন্য সেগুলোই যথেষ্ট হবে। তবে এখানে সংক্ষেপে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, তা হলো বিজ্ঞ সালাফী আলেমদের সকলেই ফিলিস্তিনি সংগঠনগুলোর আকীদাহ ও মানহাজ সংশোধন করার নসীহত করেছেন। কারণ, আকীদাহ-মানহাজ ঠিক না করে এবং শক্তি সংগ্রহ না করে জিহাদে শরীক হয়ে বিজয় অর্জন করা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিটাই বেশি হয়। যেমনটা আমরা বারবারই দেখতে পাচ্ছি।

[৩] *সূরা আ-আরাফ, আয়াত : ৫৪*

প্রশ্ন (৬) *তারাবীর সলাত প্রসঙ্গে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কথা "খুব সুন্দর বিদআত" থেকে কী বুঝা যায়?*

ইদ্রীস আলী, বিরল, দিনাজপুর

উত্তর আমি বলবো, তারাবীর নামায সম্পর্কে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উক্তি: 'এটি খুব সুন্দর বিদআত' দ্বারা বিদআতের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। শরঈ অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই বাক্যটি একমাত্র তারাবীর সলাত প্রসঙ্গে বলেছেন, যা নির্ধারণ করেছিলেন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাই তার কর্মটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মের অনুসরণ মাত্র। সেটি নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মের অনুসরণ। আর নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করা বিদআত নয়; বরং তার অর্থ হলো সংস্কার করা ও বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত সুন্নাত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে শরীয়তসম্মত ঐসব আমলের কর্মের আহ্বান করা, যার দিকে আহ্বান করেছেন স্বয়ং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তিনি নিজেও তা সম্পাদন করেছেন। আর উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র দ্বিতীয় আযানের ব্যাপারে কথা হলো, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এবং অন্যান্য খলীফার সুন্নাতের অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নাতের অনুসরণ করবে"।[৪] তবে যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফা নন, তারা তাদের মতো নয়। কারণ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাতকে তাঁর সাথে ও তাঁর পরে হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সাথে খাস করেছেন। অন্যদের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। অধিকন্তু সাহাবীগণ বিদআত ও নতুন উদ্ভাবন থেকে সবচেয়ে সতর্ক করেছেন। তাদের একজন হলেন ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি বিদআত সৃষ্টিকারী এমন একটি দলের প্রতিবাদ করেছেন, যারা ভালো নিয়তে দীনের মধ্যে একটি নতুন জিনিষ আবিষ্কার করেছিল। তারা যখন দলবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আল্লাহর যিকির করছিল, তখন তিনি বলেছেন, "তোমরা কি জ্ঞানের দিক দিয়ে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদেরকে ডিঙিয়ে গেছ? নাকি অন্যায়ভাবে বিদআত নিয়ে এসেছ? উত্তরে যখন তারা বলল, 'আমরা ভালো নিয়তে করছি'। তিনি তাদের বললেন, "প্রত্যেক কল্যাণের ইচ্ছুক তা অর্জন করতে পারে না"।[৫] তিনি তার মজলিসে স্বীয় সাথীদের বলতেন, "তোমরা অনুসরণ কর; কিন্তু বিদআত করো না"। ইবনে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: "প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী, যদিও মানুষ তা উত্তম মনে করে"।

প্রশ্ন (৭) *কবরের ওপর যদি গম্বুজ বা অন্য কিছু নির্মাণ করা হারাম হয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের ওপর সবুজ রঙের গম্বুজ নির্মাণ করা হলো কেন? দয়া করে জানাবেন*

কাবীর হোসেন, কালুখালী, রাজবাড়ী

উত্তর আমি বলবো, কবরের ওপর গৃহ বা অন্য কিছু নির্মাণ ঘৃণিত বিদআত। কারণ এতে দাফনকৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয় এবং এটি শিরকের উসিলা। তাই বিদআত বন্ধে ও শির্ক উৎখাত করণার্থে কবরের ওপর নির্মিত স্থাপনা অপসারণ ও সেটাকে মাটির সমান করা জরুরি। ইমাম মুসলিম আবুল হায়াজ আসাদি হায়ান বিন হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমাকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুলাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন আমি কি তোমাকে তা দিয়ে পাঠাব না? কোনো ছবি নিঃশেষ করা ব্যতীত রাখবে না এবং কোনো উঁচু কবর মাটির সমান না করে ছাড়বে না"।[৬]

আপনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের ওপর যে গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন, সেটা তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করে তৈরি করা হয়েছে। এটা করেছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর বহু বছর পর তুর্কী শাসকরা। তাই যা হয়ে গেছে, তা আমাদের জন্য দলীল নয়। দলীল হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।

প্রশ্ন (৮) *সম্মানিত শাইখ, আপনি জানেন যে, বর্তমানে ফিলিস্তিনের গাজা নগরীতে মুসলিমগণ ভয়াবহ বিপর্যয়ের শিকার। এই দুঃখজনক প্রেক্ষাপটে একজন মুসলিম কিভাবে দায়িত্ব পালন করে কিয়ামতের দিন হতে রেহাই পেতে পারে?*

রায়হান উদ্দীন, চাটমোহর, পাবনা

উত্তর প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তরে আমরা বলবো যে, প্রত্যেক মুসলিম আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে। আলেমের ওপর এমন বিষয় ওয়াজিব, যা সাধারণ লোকের ওপর ওয়াজিব নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা

[৪] *আবু দাউদ, হা : ৪৬০৭*
[৫] *দারিমী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হা : ২১০*
[৬] *সহীহ মুসলিম, হা : ৯৬৯*

বলব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের মাধ্যমে দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং তাঁর কিতাবকে মুমিনদের জন্য সংবিধান হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী সমাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। আলেম সমাজ এবং সাধারণ সমাজ। আর আলেমের ওপর যা আবশ্যক, সাধারণ মানুসের ওপর তা আবশ্যক নয়। আলাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর"।[৭] সুতরাং যারা আলেম নন, তাদের উচিৎ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করা। আলেমদের ওপর আবশ্যক হলো, তাদেরকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তার উত্তর দিবে। কাজেই ব্যক্তি অনুপাতে দায়িত্ব বিভিন্ন রকম হবে। আলেমদের উচিৎ, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সত্যের দিকে আহবান জানানো। সাধারণ লোকদের উচিৎ তারা তাদের নিজেদের এবং অধীনস্ত স্ত্রী-সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করা। উভয় শ্রেণীর লোকেরা তাদের দায়িত্ব পালন করলে তারা পরিত্রাণ পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না"।[৮]

পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলিমরা বর্তমানে এমন বিপর্যয়ের ভিতরে রয়েছে, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীর সমস্ত কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। যেমন নবী ﷺ বলেছেন,

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ .

"তোমাদের ওপর পৃথিবীর সমস্ত জাতি ঝাঁপিয়ে পড়বে যেভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা খাদ্যের বাসনকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। সাহাবীগণ বললেন, আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সেদিন এরকম হবে? নবী ﷺ বললেন : না তোমাদের সংখ্যা সেদিন অনেক হবে। কিন্তু তোমরা সেদিন বন্যায় ভাসমান খড়কুঁটার মতো দুর্বল হবে। তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে ভয় ছিনিয়ে নেয়া হবে। তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দেয়া হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ওয়াহান কাকে বলে? উত্তরে তিনি বললেন, দুনিয়ার ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[৯]

সুতরাং আলেমদের উচিৎ মুসলমানদেরকে সংশোধন করা। আর তা সঠিক তাওহীদ এবং বিশুদ্ধ ইবাদত ও চরিত্র শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। প্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ নিজ দেশে কাজ করবে। সঠিক আকীদাহ এবং বিশুদ্ধ ইবাদত ও চরিত্র শিক্ষা দানের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ এই যে, তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অক্ষম। কারণ তাঁরা ঐক্যবদ্ধ নয়। তারা এক দেশ বা একই কাতারে সমবেত নয়। তাই শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্তমানে এ ধরনের জিহাদে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে তাদের উচিৎ শরীয়তসম্মত সকল প্রকার উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা। যদিও আমাদের শক্তি থাকে তথাপিও আমরা কিছু করতে সক্ষম নই। কারণ অনেক ইসলামী দেশের সরকার ইসলামী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র চালায় না। সুতরাং যেহেতু আমরা জিহাদ করতে সক্ষম নই তাই আমাদের উচিৎ আমরা আকীদাহ, আমল ও চরিত্র সংশোধনের কাজে লিপ্ত থাকব। সেই সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে এখনই জিহাদে বের হওয়ার আহবান না করে বা সেই ধরনের কোনো তৎপরতায় অংশ গ্রহণ না করে শরীয়তসম্মত পন্থা অবলম্বন করব। সুতরাং যে দেশে ইসলামী শাসন নেই সে দেশের আলেম ও দাঈগণ যদি উপরোক্ত কাজে লিপ্ত থাকে তথা আকীদাহ, আমল ও চরিত্র সংশোধনের কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সেই ঘোষণা বাস্তবায়ন হবে এবং

[৭] *সূরা আম্বীয়া, আয়াত : ৭*
[৮] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৮৬*
[৯] *আবু দাউদ, অধ্যায় : কিতাবুল মালাহিম।*

সেদিন তারা আল্লাহর সাহায্য পেয়ে খুশী হবে। আল্লাহর বাণী :

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾

"এবং মুমিনগণ সেদিন আল্লাহর সাহায্যে আনন্দিত হবে"।[১০]

প্রশ্ন (৯) *আমি নামাযে এবং অন্যান্য ইবাদত যেমন কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে অনেক চেষ্টা করেও মন বসাতে পারছি না। দয়া করে জানাবেন ইবাদতের সময় কিভাবে আমার পক্ষে একাগ্রতা রক্ষা করা সম্ভব?*

ইমাম হাসান, হাতিয়া, নোয়াখালী

উত্তর বিনয়-নম্রতা ও একনিষ্ঠতা রক্ষা করা নামাযের প্রাণ ও মগজস্বরূপ। এর অর্থ হচ্ছে, নামাযে অন্তর উপস্থিত রাখা। মুসল্লির মন যেন ডানে-বামে ঘুরাফেরা না করে। মুসল্লি যখন নামায পড়া অবস্থায় তার মনে এমন কিছু অনুভব করবে যা তার অন্তরের একাগ্রতা সরিয়ে ফেলে, তখন সে যেন আঊযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম পাঠ করে। যেমনটি নবী ﷺ আদেশ করেছেন। শয়তান মানুষের সমস্ত এবাদত বিশেষ করে তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্যদানের পর সর্বোত্তম ইবাদত সলাত বিনষ্ট করার জন্য সর্বাধিক আগ্রহী। নামাযরত ব্যক্তির কাছে শয়তান আগমন করে বলে, অমুক কথা স্মরণ করো, অমুক কথা স্মরণ করো। তাকে এমন কিছু চিন্তা করায় যাতে কোনো উপকার নেই। নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার মাথা থেকে এসব খেয়াল শেষ হয়ে যায়।

অতএব মানুষের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, নামায এবং অন্যান্য ইবাদতের সময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হওয়া। আর যখন সে এতে কুমন্ত্রণা ও ওয়াস্ওয়াসা অনুভব করবে তখন সে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। চাই তা রুকু অবস্থায় হোক অথবা তাশাহুদ পাঠ করা অবস্থায় হোক কিংবা বসা অবস্থায় হোক কিংবা অন্য কোনো অবস্থায়।

[১০] *সূরা রোম, আয়াত : ৪- ৫*

নামাযের মধ্যে বিনয়ী থাকার সর্বোত্তম সহায়ক জিনিস হচ্ছে বান্দা মনে করবে যে, সে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান এবং সে তার মহান রবের সাথে চুপিসারে কথা বলছে।

প্রশ্ন (১০) *সম্মানিত শাইখ! সেদিন একজন মিডিয়া প্রসিদ্ধ পিএইচডি ডিগ্রিধারী আলেমকে বলতে শুনলাম বুকের ওপর হাত বাধার হাদীসটি দুর্বল। আমি তার কথার ওপর আপনাদের মন্তব্য জানতে চাই।*

ইয়াসীন আরাফাত, মিঠাপুকুর, রংপুর

উত্তর নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখা সুন্নাত। সাহাল বিন সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

"লোকেরা নির্দেশিত হতো, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর ওপর স্থাপন করে"।[১১]

কিন্তু প্রশ্ন হলো হাত দু'টিকে কোন্ স্থানে রাখবে? বিশুদ্ধতম মতো হচ্ছে, হাত দু'টি বুকের ওপর রাখবে। ওয়ায়েল বিন হুজ্র রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

"নবী ﷺ ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বুকের ওপর স্থাপন করতেন"। হাদীসটিতে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও এক্ষেত্রে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের তুলনায় এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী। ইমাম ইবনে খুযায়মা সলাত অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ডান হাত বাম হাতের বাহুর ওপর রাখার ব্যাপারে বুখারীতে উল্লেখিত হাদীসটিতে বুকের ওপর হাত রাখা সুন্নাত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহি আলাইহি ইবনে খুযায়মা বর্ণিত হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন।[১২] তিনি আরো বলেন, এর বিপরীত হাদীসগুলো হয় দুর্বল, না হয় ভিত্তিহীন। অতএব পিএচডি ডিগ্রিধারী আলেমের কথা সঠিক নয়। এ বিষয়ে কোনো আলেমের কথায় কর্ণপাত না করে আমাদেরকে সহীহ সুন্নাহ-এর অনুসরণ করতে হবে।

[১১] *সহীহ বুখারী কিতাবুল আযান।*
[১২] *রাসূল ﷺ-এর নামাযের পদ্ধতি*